হক আদায়

হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.)

খলিফা : মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
পরিচালক : জামিয়াতুল ইমাম শাহ্ওলিউল্লাহ্,ফুলাত,ইউপি,ভারত

অনুবাদ ও সংকলন
মুফতি যুবায়ের আহমদ
পরিচালক: ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা , ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১
www.jubaer ahmad.com

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১, ০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.hilfulfujul.com

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৮ ইং.

হক আদায় করা
❖ হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী, **অনুবাদ,** মুফতি যুবায়ের আহমদ
প্রকাশক : আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী
❖ **স্বত্ত্ব :** পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করার শর্তে অনুবাদকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ বইটি প্রকাশ করতে পারবেন
❖ **কম্পোজ :** মাও.আলী হাসান

প্রাপ্তিস্থান
ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা , ঢাকা-১২১৪
ও বায়তুল মোকার্রমসহ অন্যান্য লাইব্রেরি
WWW.JUBAERAHMAD.COM
WWW.KAGOJERFUL.COM
WWW.FACEBOOK.COM/KAGOJERFUL24

মূল্য : ৬০ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে, যারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে ইসলামের সুশীতল হাওয়া পৌঁছে দেয়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন– তাদের রূহের মাগফিরাত কামনায় ও মাকাম বুলন্দে, বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরব্বী ও পীর মুরশিদ মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নদভী (রহ.)-এর খলীফা, দা'য়ী-এ ইসলাম হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী দামাত বারাকাতুহুমের নেক হায়াতের প্রত্যাশায় বইটি উৎসর্গ করা হল।

বিনীত

যুবায়ের আহমদ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের (মঙ্গলের) জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করো ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন করো।'

-সূরা আলে ইমরান-১১০

প্রকাশকের কথা

আমার মালিকের অপার রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের আশায় 'হক আদায়' পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্যোগী হয়েছি।

হৃদয়ের গভীরতম কোণ থেকে একটি ক্ষীণ আশাই উৎসারিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে, যদি কোন আল্লাহ্‌র বান্দা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পুস্তিকাটি পাঠ করে মানুষের হক আদায় করে, বিশেষ করে অমুসলিমদের মাঝে তাদের হক ইসলাম পৌঁছিয়ে দিয়ে তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন, সেই উসিলায় আল্লাহ্‌ তাআলা যদি আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর ক্ষমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেন। সেই সাথে প্রবল প্রত্যাশা, এই কাজে সহযোগীসহ সকল পাঠক-পাঠিকাকেও যেন মেহেরবান মালিক কবুল করেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ রইলো, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি মুদ্রণগত কোনো ভুল-ত্রুটি থেকে যায়, সেজন্য আমি অনুতপ্ত। আমার এই অপরাধ মার্জনাযোগ্য মনে করে এই বইটির ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকবো। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার জন্য আমার মালিকের নিকট এই প্রার্থনাই রইলো- তিনি যেন তাঁদের সাথে আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর ক্ষমার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন।

তালাত মোহাম্মাদ তৌফিকে এলাহী
১৮-০৭-২০১৮ ইং

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান স্রষ্টার, যিনি জীন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই এবাদত করার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। পরিপূর্ণ রহমত নাযিল হোক সাহাবায়ে কেরাম ও আজ পর্যন্ত ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গকারী ও মহিমান্বিত মহামণীষীদের প্রতি।

২০১৬ সালে ফুলাতে গিয়েছিলাম হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী দা.বা.- এর সহবতে, নিজের আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে। আলহামদুলিল্লাহ ! লাগাতার দুই মাস হযরতের সহবতে থাকার সুযোগ হয়েছিল। হযরতের সাথে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সফর করার সুযোগও হয়েছিল। ভারতের বিহার প্রদেশের পাঠনা জেলার সিংয়া নামক স্থানে হযরতের একটি প্রোগ্রাম হয়েছিল। সেখানে হযরত হক আদায় করার বিষয়ে বয়ান করে ছিলেন। বয়ানটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল। বয়ানটি সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম, পরবর্তীতে সেই বয়ানটি লিখে বংলায় অনুবাদ করি যাতে আমাদের দেশের পাঠকগণ এই বয়ান থেকে উপকৃত হতে পারে। বয়ানটির বিষয় হলো হক আদায় করা। পরিবারের হক, প্রতিবেশীর হক, স্ত্রীর হক, অমুসলিমদের হক ইত্যাদি বিষয় নিয়েই এই বয়ান।

বইটি প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন আমাদের নওমুসলিম ভাই আব্দুল্লাহ আল-আমিন ও তার বন্ধু দিদারুল ইসলাম। কম্পোজ করে সহযোগিতা করেছেন মাওলানা আলী হাসান ও মাওলানা আরিফ। আল্লাহ তাআলা সকলকে কবুল করুন। আল্লাহ তাআলা অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক সকলকেই দাওয়াত ও দীনের খেদমতের জন্য কবুল করুন। আমিন।

যুবায়ের আহমদ
১৮/৭/২০১৮ইং

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.- এর খলিফা বিশ্ববিখ্যাত দা'য়ী-এ ইসলাম হযরত **মাওলানা কালিম সিদ্দিকী দা.বা.- এর**

বাণী

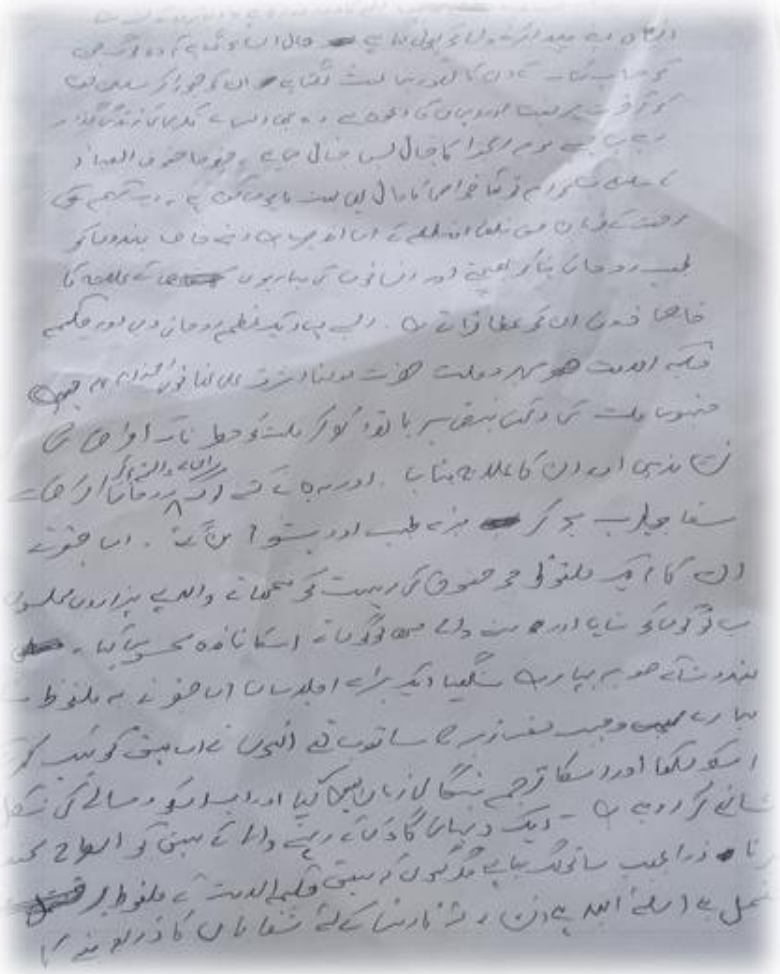

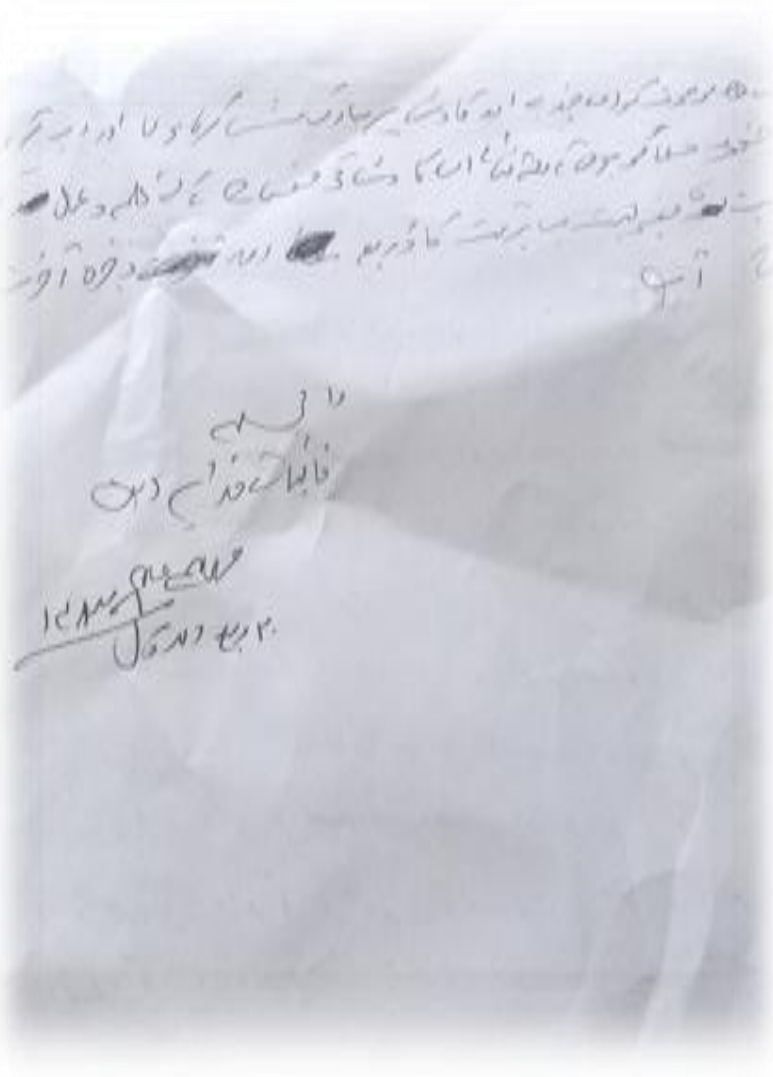

অনুবাদ

এই যুগ হলো দুনিয়া প্রেমের যুগ, জুলুম নির্যাতনের যুগ। মানুষ জাগতিক উন্নতির জন্য মত্ত। মানুষ তার সৃষ্টাকে ভুলে গেছে। পরিস্থিতি এই পর্যায়ে গেছে যে, হিসাব-কিতাবের দিন তথা কেয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। তারা তো ঐ মুসলমান যারা আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে, বিশ্বাসের দাবিও করে। তারাও উদাসীনতার জীবনযাপন করছে। পরকালের কথা শুধু কল্পনাই রয়ে গেল। বিশেষ করে বান্দার হক আদায়ের ক্ষেত্রে তো শুধু সাধারণ লোক নয়, বরং বিশেষ থেকে বিশেষ লোকেরাও উদাসীন। আল্লাহ তাআলার বড় দয়া, তিনি এই হক নষ্ট করার ও জুলুমের যুগে তার কিছু বিশেষ বান্দাদেরকে আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসক বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাদেরকে এর চিকিৎসার বিশেষ রুচিও দান করেছেন। এমনই একজন আদ্ধাতিক চিকিৎসক হলেন হাকিমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.। যিনি জাতির শিরায় হাত দিয়ে জাতির ভয়াবহ রোগগুলো চিহ্নিত করেছেন। সাথে সাথে তার থেকে উত্তরনের ব্যবস্থাও করেছেন। না জানি কত মানুষ তাদের থেকে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছেন।

এই অধম তাঁরই একটি বাণী যা হক আদায়ের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এই বিষয়টি বুঝানোর জন্য হাজারো মাহফিলে আলোচনা করেছি। এবং শ্রোতারাও এর গুরুত্ব অনুভব করেছে। ভারতের বিহার প্রদেশের সিংয়া নমক এক স্থানে এক বড় মাহফিলে এই অধম এই বানী আলোচনা করেছে। আমাদের স্নেহভাজন মুফতি যুবায়ের আহমদ সাহেব ছিলেন আমার সফর সঙ্গী। তিনি এই সবকটি সংরক্ষণ করে সেটাকে লিখেছেন, এবং বাংলাভাষায় এর অনুবাদও করেছেন। বয়ানটি একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করছেন। একজন গ্রাম্য ব্যক্তির এই সবক সংরক্ষণ করার কিছুটা আশ্চর্যজনক মনে হয়। কিন্তু এই কথাগুলো হাকিমুল উম্মত রহ. এর বাণীর সাথে সম্পৃক্ত। তাই আশা করি মানুষ এ থেকে উপকৃত হবে। মুফতি সাহেবের এই জযবা আগ্রহ ও মুবারক মেহনতের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ্‌র দরবারে দুআ করি আল্লাহ্ তাআলা এই রহমতকে মুফতি সাহেবের জন্য ইলমও আমল কবুলিয়াত ও মাকবুলিয়াতের বরকতের মাধ্যম বানান এবং আখেরাতের পুঁজি বানান। আমিন।

ওয়াসসালাম
দীনের নগণ্য খাদেম
মুহাম্মদ কালিম সিদ্দিকী

সূচী

হক আদায় করা----------১১
কাঙ্গাল কে?----------১৪
একটি ঘটনা----------১৫
নেজামুদ্দীন আউলিয়া রাহ.-এর বাইয়াত----------১৭
পিতা-মাতার হক----------২০
স্ত্রীর হক----------২২
পশ্চিমাদের নিকট নারীর অধিকার----------২৩
মুফতি শফি রহ.-এর একটি বাণী----------২৮
শ্রমিকের অধিকার----------৩০
প্রতিবেশীর অধিকার----------৩০
হারামে আরাম নেই----------৩৬
থানবী রহ.-এর একটি বাণী----------৫০
শত্রুকে বন্ধু বানানোর পদ্ধতি ----------৫১

হক আদায় করা

الحمد الله رب العامين , و الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله و صحبه اجمعين , ومن تبعهم باحسان ودعا بدعوتهم الى يوم الدين , اما بعد قال الله تعلى : اعوذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم) إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

হযরত উলামায়ে কেরাম ও সম্মানিত উপস্থিতি! আপনারা অনেকেই জানেন যে আমি মুজাফফর নগরের একটি গ্রামের অধিবাসী। আর গ্রামের লোকেরা স্বাভাবিক জীবন-যাপন করে থাকে। এটাই সাধারণ মানুষের স্বভাব। আল্লাহ তাআলা রাতকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের আরামের জন্য। ছোট বেলা থেকেই আমার মেজাজ ছিলো জেগে-ঘুমিয়ে এশার নামায আদায় করা। ধারাবাহিক সফরের কারণে এখন ঘুমাতে রাত বারোটা-একটা তো বেজেই যায়। কিন্তু এখন এটা শরীরে মেনে নেয় না। রাতে যখন কোনো মাহফিলে উপস্থিত হই, কিছু মানুষকে শোয়া অবস্থায় পাই। এতে অনেক ভালোই লাগে, যাক আমার মনমত কিছু লোক পেয়ে গিয়েছি। একদিন আমি স্টেজে উঠলাম। দেখলাম, কিছু উলামা চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে নাক ডাকছেন। এতে মাহফিলের অচেনা ভাবটিও কেটে গিয়েছে। মনে হলো এখানে আমার সমমনা কিছু লোক পেয়ে গিয়েছি। আপনারা গত রাত থেকে মাহফিল চালাচ্ছেন। দ্বীনের জন্য আপনাদের হিম্মত, জযবা, আগ্রহ ও ভালোবাসার ওপর ঈর্ষা হচ্ছে। গতকাল পুরো রাত আপনারা মাহফিলে ওয়াজ শুনেছেন। আজও সেই কখন থেকে শুরু হয়ে এখনও চলছে। আপনারা এতো সুন্দরভাবে বসে আছেন, আল্লাহ আপনাদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন।

উম্মতের মধ্যে যদি এ ধরণের আগ্রহ, দ্বীনের সাথে সম্পর্ক এবং ইশ্‌ক থাকে তাহলে হতাশ হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। যা হওয়ার হোক, কোথায় কী হবে, পরিস্থিতি যেমনই হোক, রাত যাবে, দিন তো আসবেই। সকাল আসবে, প্রভাত তো হবেই। এমন মনে হচ্ছে যেন ভোর হবেই। অনেক গুরুত্বের সাথে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। আমি সৌভাগ্যবান যে আল্লাহ আমাকে এখানে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। প্রায় তিন-চার দিন থেকে আমি অসুস্থ, জ্বরে আক্রান্ত। এখান থেকে কাছেই কিশনগঞ্জে গত বছর আমার সফর হওয়ার কথা ছিলো। আমি কয়েক মাস পূর্বে টিকিট কেটে রেখেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে শরীর খারাপ হয়ে যায়। ঘাড়ে এবং কোমড়ের প্রচন্ড ব্যাথার কারণে চলাফেরা মুশকিল হয়ে যায়। ফলে সেই সভায় আর উপস্থিত হতে পারিনি। এবার মাওলানা এসরার সাহেবের নির্দেশ থাকা সত্বেও পারিনি। আমাদের সাথী হাকীম জামাল সাহেব খুবই মনক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন সামনে কখনো হযরতের প্রোগ্রাম নিবো না। উনার দিল এতই ভেঙ্গে ছিল, এইবার যখন জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম আশংকা ছিলো, এবারও মনে হয় বিহারের সফরে উপস্থিত হতে পারব না। এরপর আবার এটাও মাথায় ছিলো যে আমাদের দাওয়াতী সাথীর মন ভাঙ্গবে। হাকীম জামালুদ্দিন সাহেবের পুনরায় রাগ এবং মনক্ষুণ্ন হওয়া আমাকে যেন সহ্য করতে না হয়, এজন্য ডাক্তার পরিবর্তন করে তাৎক্ষনিকভাবে চিকিৎসা নিই এবং ঔষধ খাই। আজ রাত্রেও আমার জ্বর ছিল, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আজ উপস্থিত হতে পেরেছি। এখানে এসে আমার ছবক শোনানোর সুযোগ হলো। আজ আমি আপনাদেরকে একটি সবক শুনাতে চাই, আমি যদি বলি এই সবকটি হাজারো মাহফিলে শুনিয়েছি, তাহলে এটা অতিরঞ্জিত হবে না। জীবনের অধিকাংশ সময় মাহফিলের জন্য অতিবাহিত হয়, বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হয়। আমার পড়া-লেখা তো নেই। অনেকদিন পর্যন্ত কিতাব হাতে নেয়ারও সুযোগ হয়নি। তাই একটি সবক কারো মাধ্যমে লিখিয়ে মুখস্ত করে নিয়েছি এবং এটাই বিভিন্ন জাগায় শুনাচ্ছি।

সৃষ্টির সেরা হলো মানুষ। মানুষকে পাঠানো হয়েছে হক্ব আদায় করার জন্য। যেই জিনিসের সাথে সম্পর্ক আছে, তার হক আদায় করার জন্য। মানুষের জিম্মায় যে হক রয়েছে শরিয়ত সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। (১) আল্লাহ্‌র হক (২) বান্দার হক। হুকুকুল্লাহ্‌ এবং হুকুকুল

ইবাদ। আল্লাহ্ তায়ালার হক হলো বড়, কারণ আল্লাহ্ তায়ালা অনেক মহান। আল্লাহ্ তাআলা প্রতিপালক, পালনকর্তা। বান্দার হকের গুরুত্বও অনেক। আল্লাহ্ তা'আলা হলো ধনী আর বান্দা হলো ফকির্।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

হে মানুষ সকল! তোমরা সকলেই ফকির এবং ভিক্ষুক আর আল্লাহ হলেন ধনী এবং প্রশংসিত।[১]

দুনিয়ার সবাই জানে বড়দের মোকাবেলায় ছোটদের হকের গুরুত্ব অনেক বেশী। একজন কোটিপতি সে যদি কারো কাছে একলক্ষ টাকা পাওনা থাকে তাহলে এর জন্য তার চিন্তায় থাকেন যে, কোনো সময় টাকাটা হয়তো পেতে পারি। এক লক্ষ টাকার জন্য তার কোনো কাজ আটকে থাকে না। কিন্তু একজন দিনমজুর দৈনিক ৫০ টাকা পেয়ে তার থেকে ১০ টাকা যদি কাউকে দিয়ে দেয় তাহলে তার অন্তরের মাঝে সব সময় এই ১০ টাকার চিন্তা থাকে। কখন ১০টাকা দিবে, সেই টাকা পেলে আমি অমুক কাজ করব। এর দ্বারা বুঝা যায় কোটিপতির একলক্ষ টাকার বিপরীতে দিন মজুরের ১০ টাকার গুরুত্ব অনেক বেশী। এটা স্বভাবজাত নিয়ম। মানবীয় নিয়মের প্রতি খেয়াল রেখে হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহ তাআলা হিসাব নিকাশের জন্য ডাকবেন, তখন আল্লাহ তাআলা নিজের হকগুলো ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু বান্দার হকের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা নিজের জিম্মায় রেখেছেন। নিজের জিম্মায় চড়ান্ত খেয়াল রেখে হিসাব হবে। এমনকি হাদিস শরিফে আছে এক শিংওয়ালা বকরি শিংহীন বকরিকে আঘাত করলে, তখন আল্লাহ তাআলা শিংওয়ালা এবং শিংহীন বকরিকে সৃষ্টি করবেন এবং শিংহীন বকরিকে শিং দেয়া হবে, অতপর তার থেকে বদলা দিয়ে দিবেন। এরপর আবার মৃত্যু হবে। জানোয়ার থেকেও হুকুকুল ইবাদ এর ক্ষেত্রে হিসাব নেয়া হবে। তাই মানুষদের খুব সতর্ক থাকা উচিত। ওখানে বান্দার হকের ক্ষেত্রে হিসাব দিতে হবে।

[১] ফাতির-১৫

কাঙ্গাল কে?

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো কাঙ্গাল কে? সাহাবারা বললেন, কাঙ্গাল সেই ব্যাক্তি যার কাছে টাকা পয়সা নেই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংশোধন করে বললেন, কাঙ্গাল ঐ ব্যক্তি নয় বরং কাঙ্গাল হলো আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি যে অনেক নেক আমল নিয়ে কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে। অনেক নফল নামায পড়েছে, অনেক জিকির-আযকার করেছে, তেলাওয়াত করেছে। কিন্তু কারো জমি দখল করে। কাউকে গালি দেয়। কারো গিবত করে। সেদিন সেই হকদারগণ উপস্থিত হয়ে নিজের হক আদায়ের দাবি জানাবে। সেখানে মুদ্রা পরিবর্তন হয়ে যাবে। ওখানে কোনো সম্পদের মুদ্রা চলবে না, চলবে আমলের মুদ্রা। প্রত্যেক দেশের পৃথক পৃথক মুদ্রা হয়, যেমন এখানে রুপি চলে, আর সৌদিতে চলে রিয়াল। ঠিক এখানে সম্পদ চলে ওখানে চলবে আমল।

যখন হক পাওনাদারগণ আসবে, তখন হকের পরিবর্তে নেক আমল দিতে হবে। নেক আমল যদি শেষ হয়ে যায়, এরপরও হকদার বাকি থাকে, তাহলে তাদের বদ আমল তার মাথায় দিয়ে দেয়া হবে। পরিণামে এতো নেক আমল থাকা সত্বেও তাকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে ফেলা হবে।

বন্ধুগণ! আমাদের অবস্থা তো হলো, লেনদেন বিশেষ করে বান্দার হক আদায় করাকে আমরা দ্বীনের অংশই মনে করি না।

ভালো ভালো দীনদার, সমাজের বড় মুত্তাকি, নেককার, পরহেজগার, দায়িত্বশীল লোকদের যখন মুহাসাবা নেওয়া হয়, তখন আমাদের অধিকাংশের অবস্থা হয় এমন, মনে হয় উত্তর দেওয়ার জন্য দম ফোটা লেগে যায়। তাহাজ্জুদগুজার, সর্বদা হাতে তাসবিহ। উমরার পর উমরা। হজ্বের পর হজ্ব হচ্ছে। কিন্তু হকদারের হক আদায় করা মুশকিল হয়ে যায়। অনেককেতো এমন দেখা যায়, যাদের দানের সুখ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়ানো। অনেকে আবার দানবীর বলে প্রসিদ্ধ। কিন্তু যে পাবে তার প্রাপ্য দিতে গেলে মৃত্যু এসে যায়। বরং বন্ধুগণ! হকদারের হক আদায় করা কত গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারে আমি প্রায়ই একটি ঘটনা শুনিয়ে থাকি।

একটি ঘটনা

আমার শায়েখ হযরত মাওলানা আলী মিয়া নদভী রহ. প্রায়ই এ ঘটনা বা কবিতা বলতেন, মানুষের অন্তরে যা লেগে যায় সেটা মনে থাকে। আর যা মনের মধ্যে জমা থাকে সেটা বার বার মুখে আসে।

একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন, ভালো মুহাদ্দিস ছিলেন। নাম হলো ইয়াহিয়া উন্দুলুসী রহ.। তিনি ইমাম মালেক রহ.- এর শিষ্য ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। দুনিয়ার মুহাদ্দিসগণ হলেন তার শিষ্য। তার হাদিসের দরস ছিল অনেক বেশি। হাদিসের কিতাবগুলোতে তার ক্লাসের বিবরণ পাওয়া যায়। একবার তাঁর ক্লাশের দোয়াত গণনা করা হল, দেখা গেল সেখানে পাঁচ হাজার দোয়াত ছিল। আর একটি দোয়াত দিয়ে পাঁচজন মানুষ লিখতেন। হযরত ইয়াহয়া উন্দুলুসী রহ. হাদিস বলতেন, আর ছাত্ররা লিখতো। শেষ পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য মাঝে বিশ পঁচিশজন লোক থাকতো। সে যুগে তো মাইক ছিল না। সে যুগে উস্তাদ বলতেন ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এরপর ছাত্ররা বলত ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এরপর ঐ বিশ পঁচিশজনের মাধ্যমে মজলিসের শেষ পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে যেত। এ থেকে অনুমান করুন কতবড় ছিল তাঁর ক্লাশরুম। এর দ্বারা কতবড় ভালো কাজ চলছিল।

হঠাৎ একদিন সকালে তিনি ক্লাশে এসে বললেন, আগামিকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাশ বন্ধ থাকবে। মানুষজন খুব অবাক হলো। অনেক আফসোস করতে লাগলো। এতো সুন্দর ভালো কাজ চলছিল, এর কি অবস্থা হবে? এমন কি সমস্যা যে, আপনি অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি ঘোষণা করলেন? উত্তরে ইয়াহয়া আন্দালুসী রহ. বললেন, কাইরুওয়া শহরের এক ব্যক্তি আমার কাছে এক দিরহাম পায়। আমি বহুদিন থেকে আল্লাহর কাছে দুআ করছি, আল্লাহ যেন আমার মৃত্যুর পূর্বে সেই লোকের পাওনা যেন পরিশোধ করার তৌফিক দান করেন। এর জন্য আল্লাহর দরবারে বহু কান্নাকাটি করেছি, বিচারের দিনে যেন ফেঁসে না যাই। এক দিরহাম কতটুকু? এক দিরহাম হলো মাত্র সারে তিন আনা। আর কাইরুওয়া হলো আফ্রিকার একটি শহরের নাম। হযরত উসমান রা. এর

যুগে সেখানে একটি ছাউনি ফেলা হয়েছিল। সেখানে মুসলমানেরা একটি শহর আবাদ করেছিল। উন্দুলুস থেকে কাইরুওয়া প্রায় অর্ধ দুনিয়ার দূরত্ব। ছাত্ররা আপত্তি করলো যে হুজুর আপনি এতো বড় হাদিসের ক্লাশ ছেড়ে আপনি যে কাইরুওয়া যাচ্ছেন, এতে কত ছাওয়াব পাবেন? উত্তরে হযরত ইয়াহয়া উন্দুলুসী বললেন, শুনে নাও এর কী লাভ। আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত একটি হাদিস শুনেছি। কারো একটি পাওনা দিরহাম পরিশোধ করা এক লক্ষ, এক লক্ষ, এক লক্ষ, এক লক্ষ, এক লক্ষ, এক লক্ষ দিনার সদকা দেয়া থেকে উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাথে ছয় লক্ষ বলতে পারতেন কিন্তু উম্মতকে এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য পৃথক ভাবে এক লক্ষ-এক লক্ষ করে ছয়বার বলেছেন। কত দয়াবান নবী যে উম্মতকে কেয়ামত দিবসের ভয়াবহ অসম্মান থেকে বাঁচানোর জন্য এবং সতর্ক করার জন্য এ কথা বলেছেন। আমাদের কি অবস্থা! আমাদের উপর স্ত্রীর মহর ছিল, বোনের ওয়ারিস ছিল, ঋণ ছিল। তা ফিরিয়ে দেওয়ার কি কোনো চিন্তা করেছি? হকদারদের হক ফিরিয়ে দেওয়ার কি কোনো চিন্তা করেছি? যেখানে এক দেরহাম তার হকদারকে ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা ছয় লক্ষ দিনার সদকার সওয়াব পাওয়ার ঘোষণা করেন আমাদের প্রিয় নবী। পাওনাদারের হক আদায় করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রিয় উপস্থিতি! আমরা সুফি সাহেব, মাওলানা সাহেব, আমির সাহেব, পীর সাহেব, হাজী সাহেব, অনেকে আবার আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক রাখি। বাইয়াতও হয়ে গিয়েছি, মুরিদও হই, এর জন্য বেশী থেকে বেশী ধারণা হলো এই যে, পেছনে যা খেয়ে ফেলেছি তা হালাল, চলুন সামনে একটু সতর্ক করে চলব। ভাই! ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হলো হকদারের হক আদায় করে দেওয়া। অন্যথায় হকদার থেকে ক্ষমা করানো ছাড়া মুক্তি পাওয়া যাবে না। বান্দার হক তওবা দ্বারা ক্ষমা হবে না। আমরাও আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে বাইয়াতের সম্পর্ক করি। তাদের সাথে সম্পর্কের ওয়াদা করি। এক সময় বুযুর্গরা বাইয়াত করতেন, বিভিন্ন শর্ত শারায়েত যোগ করতেন। এ বিষয়ে একটি ঘটনা পেশ করছি।

নেজামুদ্দীন আউলিয়া রাহ.-এর বাইয়াত

হজরত নেজামুদ্দীন আউলিয়া রহ., যাকে মাহবুবুল আউলিয়া বলা হয়। তিনি মাহবুবুল আউলিয়া হলেন কীভাবে ? উনার খেয়াল হলো কারো হাতে হাত রেখে নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা দরকার। পুরো দুনিয়ায় হযরত বাবা গঞ্জশকর ব্যতিত কারো প্রতি দৃষ্টি আটকেনি। তিনি বাদাউন থেকে পাক পাটন আজুধন পর্যন্ত পায়ে হেটে উনার কাছে উপস্থিত হলেন। গিয়ে বললেন, হযরত! আমি আপনার মুরিদ হতে চাই। আপনার হাতে হাত রেখে সত্যমনে তওবা করতে চাই। **হযরত** গঞ্জশকর রহ. বললেন বাবা সত্যিই মন থেকে তওবা করতে এসেছো? তিনি বললেন, জি, আমি সত্য মনে তওবা করতে এসেছি। হযরত বললেন তোমার কাছে কারো কোনো হক পাওনা আছে কি? তোমার কাছে কেউ কিছু পায় কি না? আমি আপনি হলে বলতাম, এত দূর থেকে সফর করে এসেছি, লম্বা দাড়ি, দুনিয়ার মানুষ আমাকে নেক মনে করে। আমি কার হক মেরে আসবো? কিন্তু নিজামুদ্দীন রহ. চিন্তা করলেন শায়েখ যেহেতু বলেছেন, তার বান্দার মুখ দিয়ে বের হয়েছে অবশ্যই কোনো দুর্বলতা রয়েছে, তিনি মাথা ঝুকিয়ে বসে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ ভেবে চিন্তে বললেন, হযরত আমি তো বড়ো জালেম। হযরত বললেন, কী হলো? তিনি বললেন, একজন লালাজি আমার কাছে এক আনা পায়। তার কাছে আমি এক আনার ঋণী। দিল্লিতে পড়ালেখাকালে উনার কাছ থেকে কালি আর তৈল ক্রয় করতাম। আধা আনা তিন পয়সা তিনি পেতেন এর সাথে তাকে একটি কিতাব দিয়েছিলাম বাঁধিয়ে দিতে। ভেবেছিলাম একসাথে টাকা দিয়ে দিব।

লালাজি কারো দিয়ে বইটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যখন পয়সা দিতে চাইলাম, তখন জানতে পারলাম সেই লালাজি ওখান থেকে চলে গেছেন। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় চলে গিয়েছে? তিনি বললেন, সে তো অনেক দূর চলে গিয়েছে। পাক পাটন চলে গিয়েছে। সেই লালা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তার ছেলে গুজরাটে থাকতো সে তার কাছে

নিয়ে গিয়েছে। তখন হযরত বললেন তুমি আগে তার পাওনাটা দিয়ে এসো, এরপর তওবা করতে এসো। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সকল জীবনী লেখকগণ এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন। পাট পাটনা আজুধন থেকে সেই একআনা পরিশোধের জন্য পায়ে হেটে পাটন গুজরাটে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে দেখেন লালাজী অনেক অসুস্থ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন।

তিনি অনুমতি নিয়ে ভিতরে গেলেন। গিয়ে বললেন, লালাজি ! আমি নিজামুদ্দীন দিল্লী থাকতাম। আপনি আমার কাছে এক আনা পেতেন, সেটা পরিশোধ করতে এসেছি। লালাজি বললেন বেটা আমার তো মনে হচ্ছে না। কীসের পয়সা? নেজামুদ্দিন রহ. বললেন, আমি তৈল আর কালি নিতাম, একটি বই বাঁধাই করতে নিয়েছিলাম। লালাজি বললেন, দেখ আমারতো মনে নেই তবে তুমি যেহেতু বলছ তাহলে দিয়ে যাও কিন্তু এটাতো বল কোথা থেকে এসেছ। তিনি বললেন, আমি পাক পাটন থেকে এসেছি। লালাজি বললেন, আমিও তাই ভাবছিলাম, তুমি পাক পাটন আজুধন থেকে এসেছো। কারণ, আমি শুনেছি সেখানে মুসলমান থাকে। এক সময় বলত পাক পাটন থেকে এসেছে মানেই হলো মুসলমান এসেছে। অর্থাৎ মুসলমান মানেই হলো তারা হক আদায় করে এটার প্রতীক হবে।

বন্ধুগণ! এই ছিল মুসলমানদের অবস্থা। বর্তমানে আমাদের অবস্থা কী? কিছুদিন পূর্বে এক হাজী সাহেব একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। পাকিস্তানের এক পার্সির কাছে একজন কর্মচারি কাজ করত। সে মেশিন চালাতো। কোনো ভুলের কারণে সেই মেশিন নষ্ট হয়ে যায়। এটাকে সেই কর্মচারির ভুল মনে করে পদচ্যুত করে দিয়েছিলো এবং আড়াই মাসের বেতন আটকিয়ে দিয়েছিলো। লোকটি ছিল গরিব মানুষ, সে খুব অস্থির হয়ে যায়। এদিক ওদিক থেকে সুপারিশ করাতে লাগল, কিন্তু কোনো কাজ হলো না। উল্টো বললো, আমি তো তার নামে মামলা করে দিব। কীসের টাকা? নিরাশ হয়ে সেই বেচারা পার্সি ধর্মীয় নেতার কাছে অভিযোগ করলো। গিয়ে বলল, আপনার অমুক ভক্ত এবং ছাত্র সে আমার আড়াই

মাসের বেতন আটকিয়ে দিয়েছে। আমি দরিদ্র মানুষ, আমার অভাব চলছে। আপনি একটু সুপারিশ করে দিন। তার ধর্মীয় নেতা একটি কাগজে এক লাইন কিছু লিখে একটি খামের মধ্যে ভরে দিয়ে বলল এই খামটি মালিককে দিতে। যখন চিঠিটি নিয়ে সেই পার্সি মালিকের কাছে নিয়ে দিল, চিঠিটি নিয়ে যখন পড়ল, সংগে ক্যালকুলেটার নিয়ে হিসাব করে আড়াই মাসের পাওনা টাকা ফিকে দিয়ে বলল, নে, তোর টাকা নিয়ে যা। এবার সে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা ! এই এক লাইনে এমন কি লেখা আছে যে আপনি এতো সুপারিশ করার পরও দিলেন না। অথচ মাত্র এক লাইনের চিঠি পেয়ে টাকা দিয়ে দিলেন। কী এমন লেখা আছে তাতে? ম্যানেজার বলল, কাগজটিতে কী লেখা আছে তুমি দেখতে চাও? নাও, পড় - বলে তার হাতে দিয়ে দিল।

সেখানে লেখা ছিল, "মিঞা! তুমি আবার কবে মুসলমান হয়ে গেলে যে, শ্রমিকের পাওনা টাকা মেরে দেওয়া শুরু করে দিয়েছো?" পার্সি ধর্মীয় নেতা তার শিষ্যকে এই কথা লিখছে। এক সময় তো ছিল যে লালাজি নিজামুদ্দীন আউলিয়া রহ. কে বলেছিল- আমি ভাবছিলাম তুমি পাক পাটন থেকে এসেছ। কারণ সেখানে মুসলমান থেকে। আর আজ পার্সি ধর্মীয় নেতা তার মুরিদকে লিখছে- মিঞা! কবে থেকে মুসলমান হয়ে গেলে যে দিন মজুরের শ্রমিকের টাকা মেরে খাচ্ছ।

বন্ধুগণ! প্রকৃত মুসলমানী হলো হক আদায় করা। এমন অনেক হক আছে যেগুলো আমরা দেখে শুনেও সেসব হকগুলোকে নষ্ট করছি। মানুষের জন্য আল্লাহর হক হলো সবচেয়ে বড়। আল্লাহর হক হলো আল্লাহকে মানা, নিজেকে আল্লাহর জন্য সুপর্দ করে দেওয়া। আল্লাহকে ছাড়া আর কাওকে না মানা। এই জন্য 'লা ইলাহা'র মধ্যে প্রথমে আল্লাহকে ছাড়া সবকিছুকে অস্বীকার করা হয়েছে। আমি তো বান্দা, আমার উপর রয়েছে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক। তার হক তো অনেক বিস্তারিত, সংক্ষিপ্ত হলো

আমাদের থেকে যে হক নষ্ট হচ্ছে, তা তো নষ্ট হচ্ছেই, কমপক্ষে এতোটুকু হতে পারে।

কোন মানুষ ঐ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, ঈমানদার বলা যাবে না, যে পর্যন্ত তার ইচ্ছা ইসলামের দ্বীনের অনুগত না হবে এবং সুন্নত তার স্বভাবে পরিনত না হবে। সুন্নত স্বভাবে পরিনত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো- যেমন মাছের স্বভাব হলো পানিতে থাকা। মাছকে পানি থেকে বের করে ফেললে মাছের কি অবস্থা হবে? তার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়ে যাবে, ছটফট করতে শুরু করে দেবে। বেশী সময় জীবিত থাকতে পারবে না।

বাস্তবতা তো হলো এই যে, নবীজীর হক আদায়কারী মুমিনের মর্যাদা তো হবে এমন যে, সে সুন্নতের পরিপন্থি বিবাহ-শাদী দেখে, সুন্নত ছাড়া ব্যবসা- বাণিজ্য দেখে, সুন্নতহীন পরিবেশ দেখে সে অস্থির হয়ে যাবে। ঠিক থাকতে পারবে না। পানিহীন মাছের ন্যায় যেন দম বের হয়ে যাবার উপক্রম হবে। মূমুর্ষূ অবস্থার সৃষ্টি হবে। এর প্রেক্ষাপটে হক নষ্ট হচ্ছে, যা আমরা নিজেই দেখছি। কোথায় আমাদের জীবন আর কোথায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ! এটা এক ভিন্ন দুনিয়া। আমাদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, এটা একটি ভিন্ন পথ। আমাদের কিছু মানুষের অবস্থা দেখলে মনে হয় তারা সম্পুর্ণ ভিন্ন ও উল্টো পথে চলছে।

পিতা-মাতার হক

ইসলামে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরের হক হলো পিতা-মাতার হক। কুরআনে আল্লাহ্ বারবার আল্লাহ্র হকের সাথে সাথে মাতা-পিতার হকের কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন, আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অর্থ: তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপণীত

হয়, তবে তাদের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলো না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করো।[২]

নরম ভাষার ব্যাপারে ফকিহগণ লিখেছেন- কথা বলার সময় সন্তানের আওয়াজ যদি পিতা-মাতার আওয়াজ থেকে উচু হয়ে যায় তাহলে সে কবিরা গুনাহর পাপী বলে সাব্যস্ত হবে। বেয়াদবী তো পরের কথা, ভালো ভঙ্গিতেও যদি আওয়াজ উঁচু হয়ে যায় তাহলেও কবিরা গুনাহ হবে।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থ: এবং তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত করো এবং দু'আ করো, হে আমার প্রতিপালক! তারা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন।[৩]

নিজের ভালোবাসার ডানা তাদের পায়ের নিচে বিছিয়ে দেয়া উচিত। তারা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন মেজাজে রুক্ষতা এসে যাবে, ভুলে গিয়ে বার বার খানা চাইবে। অতি বার্ধক্যের কারণে তাকে কোলে করে এস্তেঞ্জায় নিয়ে যেতে হতে পারে, সে সময় যেন সন্তান অপরাগ না হয়ে যায়। তাই বার বার এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কত দিন পর্যন্ত তোমার পিতা-মাতা তোমাদের খেদমত করেছেন! যখন তুমি অপরাগ অবস্থায় হয়ে ছিলে তখন তোমার পিতা-মাতা কীভাবে লালন পালন করেছেন !

পিতা-মাতার মধ্যে মায়ের হক অনেক বেশী। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অধিকার কার বেশী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এর পর? নবীজী উত্তরে বললেন তোমার মা। এর পর? তোমার মা। আবার জিজ্ঞাসা

[২] -সূরা বনী ইসরাঈল-২৩

[৩] -সূরা বনী ইসরাঈল-২৪

করলেন এরপর কে? চতুর্থবার বললেন, তোমার বাবা। মায়ের মর্যাদা পিতার তুলনায় তিনগুণ।

এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি জাহেলি যুগ থেকে আমার মাকে কাঁধে করে পায়ে হেটে হজ্ব করাচ্ছি। সেটা তো জাহেলি যুগ ছিল আমি সে পর্যন্ত মুসলমান হয়নি। এখন তো সত্তরটি হজ্জ হয়ে গিয়েছে।

এখন আমার মায়ের হক কি আদায় হয়ে গিয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন পর্যন্ত এতটুকু হক আদায় হয়নি একশবার ভিজা বিছানা থেকে উঠিয়ে শুকনো বিছানায় শুয়ে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে যখন আপনি দেখবেন যে, পিতা-মাতার হক আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের কি অবস্থা? আমরা তো তাদেরকে বোঝা মনে করি। আমাদের সাথে তারা সকালে কি আচরণ করেছেন সব ভুলে গিয়েছি।

স্ত্রীর হক

যেই হক আমরা বেশী নষ্ট করি সেটা হলো স্ত্রীর হক। স্ত্রীর হকের ব্যাপারে আমাদের অবস্থা কেমন?

বন্ধুগণ! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জাহিলিয়াতকে পায়ের নিচে পদদলিত করতে এসেছি। সেই জাহেলিয়াত কোনটি যা নবীজী পদদলিত করতে এসেছেন ? তিনি সবচেয়ে বড় অপরাধ শিরককে জাহিলিয়াত বলেন নি। ওলামাগণ বলেন, সবচেয়ে খারাপ যেই অপরাধ ছিল সেটা হলো নারীদের হক না দেয়া। নারীদের উপর জুলুম অত্যাচার করা। সে সময় নারীদেরকে তো মানুষই মনে করা হতো না। কন্যা সন্তান হলে কি হয় এর একটি চিত্র পেশ করছি-

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

অর্থ: যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান (জন্মগ্রহণ)-এর সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তারা চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনে মনে দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে।[৪]

[৪] সূরা নাহল-৫৮

অবস্থা তো হলো এমন অনেক ঘটনা হাদিসের কিতাবে আছে যে জীবিত কন্যা সন্তানকে মাটিতে চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পুরো দুনিয়াতে এই অবস্থা ছিল যে সৎ মাকে ওয়ারেশী সম্পদ হিসাবে বণ্টন করে দেয়া হতো। নারীদের ঋতুকালীন সময় ঘর থেকে বাইরে বের করে দেয়া হতো, গোয়াল ঘরে মাটিতে খানা দেয়া হতো। অবস্থা তো এমন ছিল যে হিন্দুস্থানের মধ্যে বিধবা নারীকে স্বামীর সাথে দাহ করা হতো। মেয়েদেরকে মন্দিরে দান করে দেয়া হতো, সে মন্দিরে দাসী হয়ে থাকতো। পরে সে কুকর্ম ও অত্যাচারের শিকার হতো। তাদের বহু নির্যাতন সহ্য করতে হতো।

পশ্চিমাদের নিকট নারীর অধিকার

পশ্চিমারা বলে আমরা নারীর অধিকার দিয়েছি অষ্টম শতাব্দীতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইশত বছর পর ফ্রান্সে খ্রিস্টানদের একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হয়েছিল। সেদিন তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিল যে, আজ থেকে আমরা নারীদেরকে মানুষ বলছি। আজকেও মানুষ হিসেবে মানছি না, মানুষ বলা শুরু করছি। আল্লাহর নবীর দুইশত বছরে শুধু বলা শুরু করেছে। ১৯৬২ সনে বৃটেনে নারীদেরকে মালিকানার অধিকার দিয়েছে। খৃস্টানদের কাছে ১৯৬২ সনের পূর্বে আজ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বা তারও পূর্বে নারীরা দশ টাকা এমনকি একটি নাক ফুলেরও মালিক হতে পারতো না। এই ছিল অবস্থা। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি নারীদেরকে সর্বস্থানে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। সে সময় কণ্যা সন্তান জন্ম হওয়া দোষণীয় মনে করা হতো। কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ছেলেমেয়েকে নেয়ামত বলে উল্লেখ করেছেন। এই তারতীব দিয়েছেন।

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

অর্থ: আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যাকে চান সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।[৫]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. লিখেন, কুরআন মাজিদের বিষয়ভিত্তিক তারতিবের মধ্যে আগে পিছে যা থাকে তা হেকমতের ভিত্তিতে হয়। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কন্যা সন্তানকে আগে ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা কণ্যা সন্তান দেন আর যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন। এর উদ্দেশ্য হলো কুরআনের তারতিবে কন্যার স্থান ১ নাম্বারে। আর পুত্র সন্তান হলো দুই নম্বরে। এই যদি তারতিব হয় তা হলে আমাদের এখানে কন্যা সন্তান জন্ম হলে তাকে ধন্যবাদ দেয়া হতো, আকিকা হতো, মিষ্টি বিতরণ হতো, আর যদি ছেলে সন্তান জন্ম নিলেও খুশি হবে। তাহলে বুঝা যাবে আপনি কুরআনি মুসলিম। যদি অবস্থা এর বিপরীত হয় যে পুত্র সন্তান জন্ম নিলে খুব ধন্যবাদ দেওয়া হয়, মিষ্টি বিতরণ হয়, আকিকা হয়, আনন্দ-ফুর্তি করা হয়। আর কন্যা সন্তান জন্ম নিলে ইমাম সাহেব ও নার্স তার বখশিস চায়না। তাহলে আপনার ডিগ্রি আসবে আপনি কুরানী মুসলমান নয়। বরং কুরানের ভাষায় বলা হয়-

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

অর্থ: বেদুঈনরা বলে আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বলো, তোমরা ঈমান আনোনি। তবে এই বল যে, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি মাত্র।[৬]

সালাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উপর, তিনি বলেছেন, যারা চারটি কন্যা হলো এবং সে তাদেরকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে যথাযথভাবে তাদেরকে প্রতিপালন করল, আর পুত্র সন্তানদেরকে তাদের উপর প্রাধান্য দিল না, বালেগ হওয়ার পর নেক ছেলের সাথে বিবাহ করিয়ে দিল, (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি আঙ্গুল একত্রিত করে বললেন) সেই পিতা ও আমি জান্নাতে এমন

[৫] সূরা শুরা-৪৯
[৬] সূরা হুজুরাত-১৪

ভাবে থাকবো (যেমন ভাবে দুই আঙ্গুল একত্রিত এক সাথে আছে)। এক সাহাবী দাড়িয়ে বললেন যদি কাউকে আল্লাহ ৩টি সন্তান দেন, তাহলে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেও। একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কারো যদি দুটি সন্তান হয়, তাহলে? নবীজী বললেন সেও। আর একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কারো যদি একটি কন্যা সন্তান হয়, তাহলে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বোঝা মনে না করে তাকে নেয়ামত মনে করে কেউ যদি লালন পালন করে, পুত্র সন্তানের উপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে সেও। ছেলে সন্তান হলে খুশি হই। ছেলে থাকে উপরে আর মেয়ে থাকে নিচে। মেয়েরা যদি আগে খানা শুরু করে দেয় তাহলে আমরা বলি যে, আরে তুমি মেয়ে হয়ে ছেলের আগে খানা শুরু করে দিয়েছ। এটা হলো জাহেলিয়্যাত, মূর্খতা। যদি কোন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি চাও শেষ চাওয়া চেয়ে নাও, তোমার শেষ আশা কি? তখন তার এর চেয়ে বড় আশা করতে পারিনা যে, আল্লাহর নবীর পায়ের নীচে আমার স্থান হয়ে যায় জান্নাতে, তাহলে যে কাজ করতে হবে সেটা হলো মেয়েদেরকে নেয়ামত মনে করে লালন পালন করবে।

বন্ধুগণ! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর আগমনের পর কন্যা সন্তানদের কী পরিমান মূল্যায়ণ করেছেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কন্যাদের পিতা। এটা যদি ইজ্জত সম্মানের বিষয় হয় তাহলে সেটা হবে আমার। অধিকাংশ বিবাহ শাদিতে দেখা যায় যে আমরা নিজেরা খুব ছোট ও বিনীত হয়ে নম্রতার সাথে বলি, আমরা তো মেয়ে ওয়ালা। আমরাতো কিছু বলতে পারবো না। এটা অপারগতা, আমাদের অবস্থান তো হলো নিচে। বিষয়টি এমন যে, যারা নিজেদেরকে মেয়ে ওয়ালা বলে তারা কেমন জানি নবীজীকে অবজ্ঞা করল, নিচু করল। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি হলাম মেয়ে ওয়ালা।

বন্ধুগণ! আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সবচেয়ে বড় অর্জন হলো, স্ত্রীগণ মর্যাদার ক্ষেত্র হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম স্বামী হলো সেই, যে নিজের স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে। আর আমি হলাম তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারকারী। এইজন্য ডাক্তার আব্দুল হাই সাহেব যিনি হযরত থানবী রহ. এর খলিফা, এবং মুফতি তকি উসমান সাহেবের শাইখ; তিনি বলতেন, মাওলানা হওয়ার সার্টিফিকেট দিবেন মাদরাসাওয়ালা। ডাক্তার হওয়ার সার্টিফিকেট দিবেন মেডিকেল কলেজ ওয়ালা। ভালো নেক-মুত্তাকী হওয়ার সার্টিফিকেট দিবেন নিজের স্ত্রী। স্ত্রী যদি বলেন ভালো, তাহলে ভালো।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.- কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন– আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক তাঁর উপর, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাসায় আসতেন তখন আমাদের সাথে সকল কাজে সমান ভাবে শরিক হতেন। বিস্তারিত বললেন- নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর পরিস্কার করতেন, রুম ঝাড়ু দিতেন। তিনি নিজের জুতা নিজে ঠিক করতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাপড় নিজে পরিস্কার করতেন। পোষা জানোয়ারকে নিজে খাবার খাওয়াতেন। তিনি বকরির দুধ দহন করতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবজি কাটতেন, তিনি আটার খামির বানাতেন।

বহুদিন থেকে তালাশ করছি কতগুলো দীনদার লোক আছে, সেই দীনদার লোকদের মাঝে এমন কাউকে পেয়ে যাই যিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে। সুন্নাত অনুযায়ী জীবন যাপন করে। যিনি বলবেন আমার স্ত্রী সুস্থ থাকা অবস্থায় আমি আটা পিষেছি। আটা পিষাতো ভয়ানক অবস্থা ! এই অবস্থায় যদি কেউ দেখে ফেলে তাহলে মহল্লাই হৈ চৈ মেতে যাবে। দেখ হাজী সাহেব কী করছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আত্মমর্যাদাশীল স্বামী আর কেউ হতে পারেনা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো স্বামীর উপর স্ত্রীর হক-অধিকার কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ভালো খাবার খাওয়াবে। ভালো কাপড় পরিধান করাবে। ভালো খাওয়ানো এবং ভালো পরিধান করানো। ফকিহগন এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে। পাক করা খাবার খাওয়ানো, সেলাইকরা কাপড় এবং ধোওয়া কাপড় পড়ানো স্বামীর দায়িত্ব।

আপনি যদি আপনার প্রিয়তম স্ত্রীর কাপড় ধুয়ে, পরিস্কার করে, বাথরুম পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন এবং খাবার প্রস্তুত করে যদি দস্তরখান পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন, তাহলে আপনি তার উপর অনুগ্রহ করেন নি বরং তার হক আদায় করলেন। তিনি যদি তার নিজের খাবার নিজে পাক করে খায় আপনার খাবার প্রস্তুত না করে, তিনি যদি নিজের কাপড় নিজে ধুয়ে নেয় আপনার কাপর না ধুয়ে দেয় তাহলে তিনি আপনার উপর অনুগ্রহ করলেন। কারণ তিনি নিজের হক ক্ষমা করে দিচ্ছেন। আর উনি যদি আপনার কাপড়ও ধুয়ে দেয় তাহলে আপনার উপর দ্বিগুণ অনুগ্রহ করলেন। আর আপনার সন্তানদেরও যদি খোজ-খবর নেন তাহলে আপনার উপর অনেক অনুগ্রহ করলেন। যদি আপনার পিতা-মাতা, আপনার মেহমানদের দেখাশোনা করে, তাহলে আপনার উপর শত অনুগ্রহ করল। স্ত্রী এসব কাজ করতে পারবে, করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে অনেক সওয়াব ও ফজিলত তাদের জন্য ওয়াদা করা হয়েছে মহান প্রতিদানের।

কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর বোঝাকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়। তার অনুগ্রহকে মানতে হবে। লবন যদি বেশী হয়ে যায়, খাবার দেরী হয়ে যায় তাহলে প্লেট নিক্ষেপ করা, গালি দেওয়া, এর জন্য আল্লাহর কাছে, আহকামুল হাকিমীনের দরবারে হিসাব হবে।

ইমাম গাজ্জালি রহ. লিখেছেন, হাশরের ময়দানে যখন হক আদায় করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে, যেই ব্যক্তি তার স্ত্রীর হক আদায় কারী হবে

না। সে কক্ষনও কোনো হক আদায়কারী বলে সাব্যস্ত হবে না। এই জন্য আল্লাহর কাছে যেতে হবে, হিসাব দিতে হবে, তাই হকসমূহ জানা উচিত।

আমার বন্ধুগণ! হকসমূহ জানা খুবই জরুরী। হযরত থানবী রহ. মাওয়ায়েজ 'হুকুকুন নিসা' নারীর অধিকার নামে একটি বই ছাপিয়েছে। এই বয়ানে হযরত বারবার নিম্নের আয়াত দ্বারা প্রমানিত করেছেন

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ: এ মেয়াদের মধ্যে তাদের স্বামীগণ যদি পরিস্থিতি ভালো করতে চায়, তবে সে নারীকে (নিজেদের স্ত্রীকে) ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তাদের রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে। অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।[৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, স্বামী যদি ক্লান্ত হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রী পা দাবিয়ে দিবে। স্বামীর মাথা ব্যাথা হলে স্ত্রী তৈল মালিশ করে দেবে। আর স্ত্রীর মাথা ব্যাথা হলে স্বামী, স্ত্রীর মাথায় তৈল মালিশ করে দেওয়া উচিত এটা হলো তার হক।

মুফতি শফি রহ. এর একটি বাণী

আমার বন্ধুগণ! মুফতি শফি রহ. এর একটি বাণী খুব নিকটবর্তী সময় পড়েছি। একটি হাদিসের বিষয়ে খুব মজার কথা লিখেছেন। যেই স্বামী স্ত্রীর সাথে পাক ঘরের কাজে শরিক হয়, তাহলে এটা অসম্ভব যে, তাদের দাম্পত্য জীবন অসুন্দর হবে, সুখী হবেনা, এমন হবেনা। এটা হতে পারেনা যে সেই পরিবারে জান্নতি পরিবেশ হবেনা। আমাদের দাম্পত্য জীবন পরিচালনার পদ্ধতি শিখিয়েছেন যে স্ত্রীর সঙ্গ দেওয়া। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসার পরিবেশকে কত মহব্বত ও রহমতের করেছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমার ঘুম খুব কাচা ছিল। অল্প একটু আওয়াজ হলেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত নবীজীর উপর আমার পিতা মাতা

[৭] বাকারা-২২৮

কুরবান, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওযু করতে যেতেন খালি পায়ে আস্তে আস্তে জমিনে পা রাখতেন। ধীরে ধীরে চুপি চুপি করে এসে নামাজে দাড়িয়ে যেতেন। তিনি চিন্তা করতেন পায়ের আওয়াজে জুতার ঘষাতে যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাহলে কষ্ট হবে। সফর থেকে যখন ফিরতেন, ফিরতে যদি অনেক রাত হয়ে যেত তাহলে বাসায় এসে দরজার কুন্ডি খট খাটাতেন না। বরং মসজিদ খোলা থাকতো সেখানেই ঘুমিয়ে যেতেন। রাতে ঘুমে বিঘ্ন ঘটাতেন না। সকাল বেলায় বাসায় আসতেন, এটা ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি।"

বন্ধুগণ! এটা ছিল পারিবারিক হক। যে ব্যক্তি এই হক আদায় করবে না, সে আর কার হক আদায় করবে? প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে নবীজী কত গুরুত্ব দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বে মিনায় ভাষণ দিলেন, বললেন- তিন ব্যক্তির হকের ব্যাপারে হাশরের ময়দানে আমি মুখাসেম হয়ে দাড়াব। মুখাসেম বলা হয় সরকারী উকিলকে। সরকারি উকিলের কাজ হলো অপরাধীকে শাস্তি দেয়া। সে সরকারের পক্ষ থেকে বিতর্ক করে।

আপনি অর্ধরাত পর্যন্ত চায়ের দোকানে আড্ডা দিলেন, আনন্দ-ফুর্তি করে বাসায় এসে দরজার কুন্তি খটখটালেন, সেই বেচারী আপনার অপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়ল। আর দরজা খুলতে যদি দেরী হয়ে যায়, তাহলে শুরু হয়ে যায় বেচারীর উপর রাগ ও গালির ঝড়। এমনকি অনেক সময় পরিস্থিতি তালাক পর্যন্ত গড়ায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি মুখাসিম হয়ে দারাবো।

একটি হলো স্ত্রীর হক আর একটি হলো শ্রমিকের অধিকার। শ্রমিকের হকের ব্যাপারে কত হক নষ্ট করি।

শ্রমিকের অধিকার

শ্রমিকের অধিকার হলো এই, শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার বিনিময় আদায় করে দিবে। অনেক লোক এমন আছে যারা অনেক দানবীর কিন্তু শ্রমিকের হক আদায় করার ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করে। সাধারণত এমনই হয়ে থাকে। প্রতিবেশীর অধিকার ও স্ত্রীর অধিকারের ক্ষেত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বিরোধী হয়ে যান, তাহলে কী অবস্থা হবে।

প্রতিবেশীর অধিকার

বন্ধুগণ! প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিবেশীর হক-অধিকারের ক্ষেত্রে জিব্রাইল আমিন আমাকে এতো পরিমান গুরুত্ব দিয়েছেন, ভেবেছি প্রতিবেশীরা সম্পদের ওয়ারিশ হয়ে যাবে। নবীজী আরো বলেছেন– ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে না। যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। অন্য হাদিসে বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে আহার করে আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।

এ বিষয়ে আরো বলেছেন, প্রতিবেশীর অধিকারের মধ্যে একটি অধিকার হলো, প্রতিবেশীর অনুমতি ছাড়া নিজের দেয়াল উচু করবে না। কতো দীনদার লোক বসে আছি, একজনওকি দাড়িয়ে বলতে পারবে, আমার বাসা বানানোর সময় প্রতিবেশীর কাছে প্লান পাশ করিয়েছিলাম। এমন কি হয়েছে যে প্রতিবেশীকে গিয়ে বলেছি- "ভাই! আমার বাসাটি ছোট, আপনার ভাতিজাকে বিবাহ করাতে হবে, উপরে আর একটি রুম বানাতে চাই, ইসলাম আমাকে বাধ্য করেছে আপনার অনুমতি ছাড়া যেন বাসা উচু না করি, আপনার বাসায় বাতাস আটকে যাবে, আলো কম আসবে, পর্দা করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।" এমনটি কি হয়েছে? কিন্তু আমরা বিল্ডিং-এর উপর বিল্ডিং উঠাচ্ছি, রাজউকের কাছ থেকে

ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ঘুষ দিয়ে প্লানিং পাস করিয়ে আনছি। ইসলাম বলে প্রথমে প্রতিবেশীর কাছে প্লান পাশ করাতে।

আমাদের মুরব্বীদের মধ্যে একজন হলেন মিয়াজী আজগর হুসাইন সাহেব, তিনি "ইসলামী মুআশারা" নামে একটি বই রচনা করেছেন। সেখানে এই বিষয়ের উপর প্রায় পাঁচটি হাদিস এনেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে এই জন্য পাঠানো হয়েছে যে আমি তোমাদেরকে বাধ্য করি, যেন তোমাদের নিজের প্রতিবেশীর কড়িকাঠ তোমার দেয়ালে রাখলে তোমরা বাধা না দেও। তোমার কিছু ক্ষতি হয়ে প্রতিবেশীর ফায়দা হয়ে যায়, তোমাকে যদি কিছু খরচও হয়, তোমার অসুবিধা কোথায় ? এখানে এ উদ্দেশ্য বলেছেন- প্রত্যেক প্রতিবেশীর অধিকার রয়েছে, শুধু বাসার প্রতিবেশীই নয় বরং মজলিশের প্রতিবেশীরও অধিকার রয়েছে। ক্ষেতের প্রতিবেশীরও অধিকার আছে। নারীদের অধিকার, বোনের অধিকার। ওয়ারিশদের ক্ষেত্রে এবং উত্তরাধিকারীর সম্পদের ক্ষেত্রে প্রথা হয়ে গেছে। বাবার মৃত্যুর পরপর ভাইগণ পুরো সম্পদ ভাগ-বন্টন করে নেয়, বোনদের অংশ দেয় না, ফুফুর অংশও দেয় না। সূরা নিসায় ওয়ারিসী সম্পদের যেই পরিমাণ বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে নামাজের প্রকারের ব্যাপারে এতো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন--تِلْكَ حُدُودُ اللهِ এটা আল্লাহর সীমানা[৮]

ফুকাহাগণ সেই হিসাবে এটা ঠিক করেছেন। বোন-ফুফুর অংশ না দেওয়ার কারনে সর্বদা হারাম খাচ্ছে। হারাম মাল খাওয়ার বিষয়ে কত কঠিন সতর্কবাণী এসেছে। হারাম মালের ব্যাপারে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হারাম মালের দ্বারা পালিত শরীর জান্নাতে যাবে না। এর মধ্যে এই সতর্কবাণীও রয়েছে যে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, হারাম মালে পালিত মানুষের ঈমানের উপর মৃত্যু হবে না। হাদিস শরিফে এসেছে, সরিষা পরিমান ঈমান যার অন্তরে থাকবে সেও

[৮] নিসা-১৩

জান্নাতে যাবে। কিন্তু হারাম মালে পালিত শরীর জান্নাতে যাবে না। এর ব্যাখ্যা হলো, মৃত্যুর পূর্বে ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হবে। আমরা তো মনে করি, আমাদের মৃত্যু হবে ঈমানের উপর। যে সব প্রথা আমাদের সময়ে বিদ্যমান তা আমরা করি। চাই সেটা যতই গুরুত্বহীন হোক। সমাজিক প্রথায় না থাকলে সেটা ছেড়ে দিই। চাই সেটা যত গুরুত্বপূর্ণ থাকুক। এমনিভাবে আমাদের সমাজে যেটাকে হারাম ও পাপ মনে করা হয় না সেটাকে ছেড়ে দিই। আমাদের এখানে যা হারাম ও পাপ বলে প্রচলিত সেটাকে পাপ মনে করি। যেই পাপ আমাদের সমাজে নেই সেটাকে দ্বীন মনে করি। অবস্থা তো হলো সেটাকে হালাল মনে করি। উদাহরণস্বরূপ শুকর খাওয়া আমাদের সমাজে প্রচলন নেই, এটাকে আমরা পাপ মনে করি। অপছন্দ করি। শিক্ষিত মানুষ নয় কোনো সাধারণ মুর্খ মানুষকেও যদি বলা হয় শুকরের গোশত পাকানো হয়েছে, তোমার দাওয়াত। তাহলে কোনো মানুষ যাবে কি সেই দাওয়াত খেতে? এই মানুষটিই যিনি শুকরের গোশত খেতে এত অপছন্দবোধ ও ঘৃণা করছে, সে সুদের ব্যবসা করছে। সুদের বাসা ক্রয় করছে। মটর সাইকেল ক্রয় করছে। ছেলেকে কার কিনে দিচ্ছে। ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছে, বরং সুদ দেওয়া, সুদের মধ্যস্থ হওয়া, সুদের সুপারিশ করা, সুদ লেখা, সুদে সহযোগিতা করা- এসব কিছু আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সুদের সত্তরটি স্তর রয়েছে সবচেয়ে নিম্নের স্তর হলো সুদ খাওয়া মায়ের সাথে জিনা করার সমান। শতবার শুকরের গোশত খাওয়ার পরও নিজের মায়ের সাথে জিনা করার সমান হবে না। কিন্তু শুকরের গোশত যদি কোনো মুসলিম মহল্লায় পড়ে যায় তাহলে হিন্দুস্থানে ২০ ভাগ ফাসাদ এর উপরই হয়, যে মুসলিম মহল্লায় শুকরের গোশত রাখা হয়েছে। এদিকে ব্যাংকের সুদকে ইন্টারেস্ট বলে মসজিদের টয়লেটে লাগিয়ে দেওয়া হয়, মুতাওয়াল্লী সাহেব এটাকে হারামই মনে করেন না। কারো সন্তান যদি চোর হয়ে যায়, বা ডাকাত হয়ে

যায়, আর যদি ঘটনাক্রমে ছেলেটা কোনো দ্বীনি পরিবারের হয়, তাহলে পুরো মহল্লায় থু থু দেওয়া হবে, তার দিকে চুরি ডাকাতির শাস্তি ইসলামে নির্দিষ্ট। ইসলাম কোনো ধরনের অধিকার নষ্ট করাকে পছন্দ করেনা। এটাতো অনেক খারাপ জিনিস, ইসলাম এর জন্য শাস্তি ঠিক করে রেখেছে। বরং এই লোকটি যিনি চোরকে এতো ঘৃণা করছে, সে ছেলের বিয়েতে মেয়েওয়ালার কাছে যৌতুক চাচ্ছে এবং যৌতুক আদায় করছে। মুফতি আব্দুর রউফ সিকরুযী, প্রসিদ্ধ ফকিহ, তিনি লিখেছেন রাস্তায় রাহাজানি করা, ডাকাতি করে বা চুরি করে মটর সাইকেল, কার বা অন্য কোনো জিনিস স্বর্ণ, রূপা, ইত্যাদি নেওয়া শরয়ী আইনে বা নিয়মে এতো বড় পাপ নয়, যত বড় পাপ ছেলে ওয়ালা মেয়ে ওয়ালার কাছে চেয়ে যৌতুক নেয়া। তিনি লিখেছেন, চাওয়া ছাড়া নেওয়াও জায়েজ নেই। যৌতুক আদায় করার এটাও একটি সুরত। পরিবেশই এমন করো দেওয়া যৌতুক না নিয়ে এলে সেখানে বসবাস করাই মুশকিল। সে আনন্দের সাথে জীবন যাপন করতে পারবে না। তিনি এই রায়ের পক্ষে অনেকগুলো প্রমান পেশ করেছেন।

কিন্তু মটর সাইকেল বা কার যদি চুরির হয় তাহলে মানুষ প্লেট নাম্বার বদলিয়ে ব্যবস্থা করবে, না হয় যন্ত্রাংশ খুলে বিক্রি করে দিবে। আর যৌতুকের কারটি হাজী সাহেব বা আমির সাহেব মসজিদের সামনে এনে রেখে দেয়। আর ইমাম সাহেবকে বলে হুজুর আপনি একটু গাড়িতে চড়ে বরকত দিয়ে দিন। এটাকে মন্দই মনে করিনা। হারাম মনে করিনা। এরচেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে?

বন্ধুগণ! এটা কি? আমাদের মন চাওয়া আর মেজাযের নাম ইসলাম নয়। আল্লাহর কানুন আইনের নাম হলো ইসলাম। মহর আদায় করার তো প্রথাই নেই। মহর না দেওয়া যে হারাম তাও উপলব্ধি করিনা, বান্দার হকই মনে করিনা। মহর আদায় করার নিয়তই থাকেনা। বরং মহর হলো বিবাহের শর্ত। বরং এমন অনেক ঘটনা ঘটে যে বিয়ের সময় বলে দেওয়া হয়, মহর ১০ লাখ ৫ লাখ, ৮ লাখ যা মন চায় ধরুন। কাকে এই টাকা

দিব? নাউযুবিল্লাহ! মহর আদায় করা বিবাহের শর্তের মধ্যে। মহর দেওয়ায় নিয়ত যদি না থাকে তাহলে বিবাহই হবে না। নবীজী বলেন, যদি বিবাহ হয় আর বিবাহ করার সময় ছেলের মনে নিয়ত থেকে যে মহর আদায় করবো না। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছেন فهوزان فهوزان فهوزان-সে ব্যভিচারী, জিনাকারী।

আমি এক মজলিসে মোহরের আলোচনা করছিলাম, কিছু মহিলা পর্দার আড়ালে বসা ছিল। সেখান থেকে দুইটি চিরকুট এলো সেখানে লেখা, আমাদের স্বামী বলে, যে নারী মোহরের টাকা চাবে সে জান্নাতের ঘ্রানও পাবেনা। নাউযুবিল্লাহ! মোহর না দেওয়া সাধারণ প্রথা হয়ে গেছে। বরং মহর হলো স্ত্রীর সাথে প্রথম সাক্ষাতের হক। তা প্রথম রাত্রেই আদায় করা উচিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাত্রেই মহর আদায় করে দিয়েছেন। যত দ্রুত পারা যায় মোহরানা আদায় করে দেওয়া উচিত। আমি বলছি, বোনদেরকে বলে দিয়েন। আসলেই যদি মরতে হয়, হিসাব নিকাশ যদি দিতে হয় তাহলে আপনাদেরকেও বলছি। অনুরোধ করছি নিজ স্ত্রীদেরকে গিয়ে বলে দিন। এই যুগে যে নারী আদালতে মামলা করে মোহর আদায় করবে ইনশাআল্লাহ্ জিহাদের সওয়াব পাবে। এই সময় আমরা নারীদেরকে তাদের মহর না দেওয়ার কারণে আমরা সমষ্টিগতভাবে জুলুমের স্বীকার। আমরা তো মনে করি এটাতো দেয়ার জন্য নয়, এটাতো বলার জন্য। কতবড় জুলুম !!

বন্ধুগণ! আমাদের খবরই নেই, আসলে আমাদের অসতর্কতা, উদাসীনতার জীবনের আচরন দেখলে মনে হয়, আখিরাত-পরকাল বলতে কিছু নেই। বিষয়টি আমাদের অন্তরে বসে গেছে। এইজন্য হালাল হারামের পার্থক্য শেষ হয়ে গিয়েছে। এসব বিষয়ে মাসআলা জানার কোনো প্রয়োজন বোধ করিনা। এধরনের অনেক মাসআলা আছে। উদাহরণ স্বরূপ ফুকাহাগণ লিখেছেন, সতর খুলে যেই উপার্যন করা হয় তা হারাম। কোনো পর্দাহীন নারী ক্ষেতে কাজ করছে, তার উপার্যন জায়েজ নেই, মদপান ও শুকর খাওয়ার মতো। অথবা কোনো পুরুষ আন্ডারওয়ার পরে

১০-১২ ঘন্টা প্রতিদিন মেহনত করছে দিন মুজুরের কাজ করছে। তার এই উপার্জন জায়েজ হবেনা। শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী যা হালাল সেটাই হালাল।

জমির মধ্যে যা উশরী ভূমি। মুফতি আতিক বসবি দা. বা. লিখেছেন হিন্দুস্থানে ১৩ প্রকার ভূমি আছে এর মধ্যে ১২ প্রকার ভূমিই হলো উশরী। আর তেরতম প্রকার হলো, খেরাজি, উশরী ভুমি থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত উশর আদায় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত পুরো উপার্জন হারাম হবে।

উশরী চল্লিশ ভাগের এক ভাগ নয়, উশরী ভূমি দুই প্রকারেরঃ

এক. ঐ ভূমি, যাতে পানি ক্রয় করে দিয়েছেন, কোন ভাবে বিদ্যুৎ বিল দিয়েছেন। অথবা ডিজেল ব্যাবহার করে পানি দিয়েছেন। তার মধ্যে অর্ধ উশর দিতে হবে। ২০ হাজার আমদানীর মধ্যে এক হাজার দিতে হবে। চাই সেটা ধান হোক, বা সরিষা হোক, ফল হোক সবগুলোর ক্ষেত্রে একই হিসাব। আর এক প্রকারের ভূমি হলো যা আসমানের পানি দ্বারা বা নদীর পানি দ্বারা আবাদ হয়। (আমাদের ইউপিতে এমন হয়, আপনাদের বিহারে এমন হয় কিনা জানিনা। ইউপিতে কয়েক বছর থেকে নদীর পানির বিল মাফ করে দিয়েছে। বিনামূল্যে আবাদ হচ্ছে। এসব ভূমিতে দশভাগ উশর। সেখানে যদি মধু আবাদ হয় তা তার উজন হিসাবে নেসাব হবে। সেখানে ৫ম অংশ যাকাত দিতে হবে। আমরা তো মধুর চাক ভেঙ্গে খেয়ে ফেলি। খেয়ালই হয় না, সতর্কতাহীন জ্ঞান আমাদের। কল্পনাও আসেনা হিসাব নিকাশ হবে। ব্যাস, যা প্রচলন হয়ে গেছে তার উপরই চলছি। যতক্ষণ পর্যন্ত উশর না বের করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সেই আমদানী আর ক্ষেতী আপনাদের জন্য জায়েয হবেনা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ -ফসল কাটার দিন তার হক আদায় কর।[৯]

প্রথমে উশর বের করে এরপর ব্যবহার করতে হবে। আমাদের এখানে উশর দেওয়ার প্রচলনই নেই। সংসারে বরকত হচ্ছেনা, মাথা

[৯] আনআম-১৪১

থেকে বোঝা কমেনা, এটা হয় না, ওটা হয় না। একের পর এক মসিবত সমস্যা আপদ-বিপদ ক্ষতিই সামনে আসে। কত হক নষ্ট করছি। বন্ধুগণ! যেদিকেই তাকাই সর্বদা একই অবস্থা।

শেষে দুই একটি অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করব। একটি হলো সন্তানের হক। সন্তানের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে মানুষ বলবে হুজুর সন্তানের অধিকরের সম্পর্কে আলোচনার কি প্রয়োজন। যা কিছু করছি সবতো সন্তানের জন্য। ডাকাতি করছে তো তাও সন্তানের জন্য। সুদী লেনদেন বাচ্চাদের জন্য। আপনি যদি মনে করেন বেইমানী করে বাচ্চাদের শান্তি-প্রশান্তি হবে তাহলে তা বড়োই খারাপ কথা। আল্লাহ তাআলা হারামের মধ্যে শেফা রাখেন নি।

হারামে আরাম নেই

আল্লাহ হারামের মধ্যে শেফা রাখেন নি। আল্লাহ না করুক কোন মুসলমানের সন্তান বা আপনার সন্তান হারাম মালের ভিতর লেগে যায় তাহলে এটা খুবই দুরবস্থা মা'ও নিজের সন্তান থেকে অপারগ হয়ে নিরাশ হয়ে যায়। শাসন করা ছেড়ে দেয়। কবি বলেন –

আদরের সন্তান ধ্বংস হলো তখন
মা সন্তানের ভুল ত্রুটি উপেক্ষা করল যখন।

খুবই দুঃখজনক অবস্থা। বন্ধুগণ, দেখুন আজ আমরা মনে করছি সন্তানের জন্য এটা করছি ওটা করছি, আমরা যদি তার জন্য হারাম কাজ করি তাহলে এটা হবে তার জন্য ভয়াবহ অবস্থা। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ ব্যাক্তির চেয়ে বড় আহম্মক আর কে হতে পারে, যে অন্যের দুনিয়া বানানোর জন্য নিজের আখেরাতকে ধ্বংস করে। নিজের সন্তান ও পরিবারের লোকদের জন্য উপার্জন করে আর নিজের পরকালকে করে বরবাদ। এই স্ত্রী সন্তানদের ব্যাপারে কিছু শোনেননি। যাদের জন্য আমরা যাযেজ নাজায়েজ সবকিছু করি। ইমাম গাজ্জালি রহ. এই ব্যাপারে প্রায় আটটি রেওয়ায়াত নকল করেছেন। হাশরের ময়দানে মানুষের সামনে সর্বপ্রথম যে সব লোক বিরোধী হয়ে

আসবে তারা হলো স্ত্রী-সন্তান। আল্লাহপাকের সামনে এসে বলবে- হে মাওলায়ে কারীম, আপনি আমাদের ভরন পোষণের দায়িত্ব আমাদের স্বামী-বা পিতার উপর রেখেছিলেন। তারা সেই দায়িত্ব আদায় করেনি। তারা আমাদেরকে হারাম মাল খাইয়েছেন। ফলে আমাদের অন্তর কালো হয়ে গিয়েছিল। আমরা পাপে লিপ্ত ছিলাম। এই জন্য আমাদের ভুল ভ্রান্তি ও পাপের দায়িত্ব আমাদের পিতা বা স্বামীর। তাই আমাদের সামনে তাদেরকে দোযখে ঢেলে আমাদের চক্ষুকে ঠান্ডা করুন এবং তার উপর খুব লানত ও ভৎসনা করুন। এটা কি ভায়াবহ ব্যাপার না ?

আমার বন্ধুগণ! সত্য কথা হলো এই যে শরিয়ত যেই অধিকার দিয়েছে ইসলাম অনুযায়ী ইসলাম সেটাই হক বা অধিকার। এই অধিকার গুলোর মধ্যে একটি হলো সন্তান জন্মের পর তাকে গোসল করানো, দ্বিতীয় হক হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাদা কাপড় পড়ানো, এরপর এক কানে আজান অপর কানে একামত দিয়ে তার অন্তরে তার দিল ও দেমাগে আল্লাহ নামের মহর লাগিয়ে দেওয়া। এরপর তার একটি সুন্দর নাম রাখা। (আকিকা করা) এর পরের যেই হক সেটা হলো তালিম তারবিয়াতের ব্যাবস্থা করা। যাতে সে মুসলমান হয়ে জীবনযাপন করতে পারে। এটা তার অধিকার। সাধারনভাবে সন্তানের এই অধিকার নষ্ট করা হচ্ছে। তৃতীয় হক হলো তাকে লালন পালন করা। চতুর্থ হক হলো প্রাপ্ত বয়স্ক হলে নেক ছেলে মেয়ে দেখে বিবাহ-শাদি করিয়ে দেওয়া। নামের ক্ষেত্রেও বড় অসতর্কতা করা হতো। আল্লাহ তাআলা ঐ আলেমদের মর্যাদা সুউচ্চ করুন, উত্তম প্রতিদান দান করুন। মাদরাসার ঐসব লোক যাদের বদৌলতে এসব নামের অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। আগে নাম রাখা হতো- সমারু, মঙ্গলু বুধারু না জানি আরো কত ধরনের নাম। এখন নাম কিছুটা শুদ্ধ রাখা হচ্ছে। যখন কিছু টাকার মালিক হয়ে যায়, ইংরেজী দুই একটি শব্দ শিখে, তখন সন্তানের নাম রাখা শুরু করে বৃষ্টি, সৃষ্টি- আরো কতো ধরনের নাম। এখানেও হক নষ্ট করা হচ্ছে। এই বিষয়েও আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে। সন্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে হক সেটা হলো

সন্তানের সুশিক্ষার ব্যাবস্থা করা। যাতে সে মুসলমান হয়ে জীবন যাপন করতে পারে।

বর্তমান যেই যুগ চলছে এই সময়ে আপনি যদি আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাবস্থা না করেন তাহলে সেই সন্তানের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবেন- আপনার সন্তান মুসলমান থাকবে এটা খামখেয়ালী ছাড়া আর কিছু নয়। নিশ্চিতভাবে বুঝে নেওয়া উচিত- সে ঈমানের উপর থাকবে না, মুরতাদ হয়ে যাবে। মনে করবেন- সে মুরতাদ হয়ে গেছে। কারণ আমার হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলতেন, সত্য ও বাস্তব কথা বলতেন। বাচ্চাদের অল্প বয়সে মারা যাওয়া তা থেকে উত্তম। আল্লাহ আপনার সন্তানকে নিরাপদ রাখুন। কারো হাতে যদি সন্তানের জানাযা হয় তাহলে এটা কত বড় দুর্ঘটনা! তিনি বলতেন, এর চেয়ে বড় দুর্ঘটনা হলো ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে সন্তান বড় হওয়া। বাচ্চাদের ছোট বয়সে মারা যাওয়া, ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে সন্তান বড় হওয়ার চেয়ে উত্তম। ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে বড় হওয়া সন্তান দুনিয়াতেই আপনার জীবনকে দোযখ বানিয়ে দেয়। মৃত্যুর পর যখন দোযখে যাবে তখন আপনাকে নিয়ে যাবে। এই হকের ক্ষেত্রে বড় উদাসীন আমরা। সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা মাদরাসাওয়ালার দায়িত্ব নয়। মাদরাসাওয়ালাকে বলা হয়নি যে এটা তাদের জিম্মাদারি। এটা আমাদের পিতা-মাতার দায়িত্ব। বাচ্চাদের শিক্ষার ব্যাপারে আমরা মনে করি, বেশী থেকে বেশী মাওলানা সাহেবের কাছ থেকে কালেকশন করে আমাদের সন্তানদেরকে হাফেজ মাওলানা বানাবেন। বন্ধুগণ! তাদের দায়িত্ব নয়। আমাদের হক, আমাদের দায়িত্ব। আমরা যদি এই অধিকার আদায় না করি তাহলে আল্লাহর দরবারে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। এ বিষয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। অনেক অমনোযোগী।

শেষে বিশেষ ভাবে আপনাদেরকে একটি কথা বলতে চাই। সেটা হলো প্রতিবেশী অমুসলিম ভাইদের অধিকার। এরা ঐসব লোক যাদের কাছে ঈমান নেই। যাদেরকে আমরা বিজাতি বা ভিন জাতি বলি। বিজাতি

শব্দটি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ ভুল। কুরআনের উপর আমাদের বিশ্বাস আছে। কুরআন বলে—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।[১০]

হে মানুষসকল! আমি তোমাদেরকে এক পিতামাতা থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমরা এক পিতা মাতার সন্তান। অর্থাৎ জাতির মধ্যে একটি মনস্তাত্বিক দূর্বলতা রয়েছে। সৎ পিতা-মাতা থেকে মানুষের দৃষ্টি ফিরে যায়। সৎ মা নয়; আসল মা, আপন ভাই বোন, দুনিয়ার সকল মানুষ আপনার আমার ভাই, নবীর উম্মত। দুনিয়ার সকল মানুষ আপনার আমার প্রভুর বান্দা দাস। এই তিনটি সম্পর্ক নিকটতম সম্পর্ক। যা এক বাপ এক রবের ভিত্তিতে কুরআন বলে, আল্লাহর নবী বারবার আলোচনা করেছেন। এই ভিত্তিতে যে, ইসলাম হলো আমাদের কাছে আমানত। বিদায় হজ্জের সময় যখন এই আয়াত নাজিল হলো

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

- আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।[১১]

এই আয়াত অবর্তীন হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন ভিন্ন আন্দাজে বললেন, তোমরা আমার থেকে হজ্জের নিয়মকানুন শিখে নাও। হয়তো এরপর আর সুযোগ নাও হতে পারে। আমার কাজ পূর্ণ হয়ে গেছে। সম্ভবত আমাকে চলে যেতে হবে।

[১০] -হুজরাত-১৩

[১১] -মায়েদা-৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ খুতবায় যা বললেন এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. -এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করলেন, ঐ সত্বার কসম যিনি নবীজীকে হেদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন। এটা উম্মতের জন্য ছিল শেষ ওসিয়াত। এই ওসিয়াতের সময় সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। শুধু সাহাবা রা. ই ছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বোধন করলেন- يَا أَيُّهَا النَّاسُ - 'হে মানুষ সকল!' তোমাদের পিতা একজন তোমাদের প্রতিপালক একজন। এই ধারাবাহিকতা ভুলে যেও না। এই সম্পর্ককে উপেক্ষা করো না। নিজেদেরকে বিজাতি বলো না। শুনে নাও, তোমরা সকলে আদমের সন্তান। তোমরা এক বাপের সন্তান। আর আদম আ. মাটি দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল, নিজেদেরকে বড় মনে করো না, তোমাদের তৈরির উপাদান হলো মাটি। তাই তোমাদের সম্পর্ক হলো বিনয় ও নম্রতার সাথে। মাটির উপর যদি কেউ কোনো ময়লা আবর্জনা রাখে তাহলে সে নাখোশ হয় না, বেজার হয় না, তাই বিনয় ও নম্রতা হলো তোমাদের শোভা, এটা তোমাদের বুঝা উচিত।

আমি যখন এই খুৎবা পড়ি তখন আমার কাছে মনে হয় কোনো পিতা তার সন্তানদেরকে বসিয়ে অত্যন্ত স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে উপদেশ দিচ্ছেন যে, বৃদ্ধ মাকে ভুলে যেও না, দুর্বল ফুফুকে ভুলে যেওনা। এমনিভাবে তিনি এই ওয়সিয়তকে আরো আবেগপ্রবণ বানাতে জিজ্ঞাসা করলেন, হে লোক সকল! আমাকে তোমাদের পর্যন্ত দ্বীন পৌঁছানোর জিম্মাদারী দেওয়া হয়েছিল, এই ব্যাপারে তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছি? সকলে সমস্বরে বললেন, জি! আপনি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে আরো আবেগী হয়ে তিনবার বললেন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষে এই কথা বললেন তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছ, যেই দীন তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছি, এখন এর দায়িত্ব তোমাদের

উপর। তোমরা এই দ্বীন পুরো মানবতা পর্যন্ত অর্থাৎ যারা এখানে অনুপস্থিত তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিবে। এই ইসলাম তাদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। খতমে নবুওয়াতের ফায়সালা এই কথার উপর দেওয়া হয়েছিল, আম্বিয়া আ. যেই কাজ করতেন, সেই দীনকে পুরো দুনিয়াতে পৌঁছানোর জিম্মাদারী আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাচিয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নজনের দাসত্বের লাঞ্ছনা থেকে বের করে এক আল্লাহর সাথে জড়িয়ে দেওয়া। এটা আমাদের দায়িত্ব ছিল। এই জন্যই আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে।

আমার হযরত ওয়ালা বলতেন, প্রত্যেক নবীর দুনিয়াতে আসার ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। আর আমাদের নবীর সাথে একটি উম্মত প্রেরিত হয়েছে। নবীদের পর নবী আসতেন। এখানে আল্লাহর নবীর সাথে এক উম্মত প্রেরিত হয়েছে। খতমে নবুওয়াতের ফায়সালাকে বন্ধ করার ছিলনা। দান বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ছিল। আমাদের দায়িত্ব ছিল, তাদের পর্যন্ত এই ধর্ম পৌঁছাই, কিন্তু দাওয়াত পৌঁছাবো তো দূরের কথা বরং ইসলামে আসার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছি। সত্য কথা হলো এই, পৌঁছাবো দূরের কথা, আমরা বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছি। মানবতা আজ পিপাসার্ত-তৃষ্ণার্ত। বর্তমান যুগ হলো শিক্ষা ও বুদ্ধির যুগ। এই যুগে যদি তাদের কাছে ইসলামের পরিচয় করা হয়, তা হলে এটা অসম্ভব যে তারা ইসলাম গ্রহণ করবেনা।

আমি দুই সপ্তাহ পূর্বে মুম্বাইয়ে সফরে ছিলাম। সেখানে এক কোম্পানির এক ম্যানেজার এলেন, তিনি ইসলাম বিষয়ে পড়াশোনা করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নয়া মুম্বাই নামে একস্থানে তার সাথে সাক্ষাত হলো। খুব মহব্বতের সাথে এসে সাক্ষাত করল। এসে বলছিল, মাওলানা সাহেব! আমি কুরআনে কারিম যত পড়ছিলাম আর নবীজীর লাইফ হিস্টরি সিরাতে পাক যত গবেষণা করছিলাম, এসব অধ্যয়ন করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে কুরআন ও সিরাতের মধ্যে এতো আকর্ষণ আর এতো তৃপ্তি রয়েছে, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগের চিন্তাধারার লোকের কাছে

যদি ইসলাম, কুরআন, সীরাত- এ সঠিক পরিচয় করাতে চান তাহলে (খুব ঢোক গিলে বলছিল) ইম্পসিবল, অসম্ভব যে তারা ইসলাম গ্রহন করবে না। পিপাসার্ত দুনিয়া, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় অস্থির হয়ে চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু আমরা কি করছি ?

ডাক্তার সাইদ, ডা. মিলন্দর মলহুতরা বিজিপির নেতা ছিল। তার ফুপাত ভাই ডিপিএইস এর এজুকেশনাল এডভাইজার ছিল, তিনি পুরনো দিল্লি রেলষ্টেশনে কুলিদের নামাজ দেখে প্রভাবিত হয়েছিল, এই মুর্খজাতি কুলিরা সাধারণত মুর্খ হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে এতো কি শৃঙ্খলা-সিস্টেম কোন ধর্ম সৃষ্টি করেছে। জামাত হতে দেখে খুব প্রভাবিত হলো, তিনি ইসলাম নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিলেন। দিল্লি উর্দূ বাজার থেকে "খুতবাতে মাদরাজের" ইংরেজী অনুবাদ 'মুহাম্মদঃ আইডিয়াল প্রফেট' নামে একটি বই কিনলেন। মাওলানা মঞ্জুর নুমানী রহ.- এর "ইসলাম কেয়া হ্যায় ?" এর অনুবাদ কিনে পড়লেন, কুরআন শরিফ পড়লেন। উনার অন্তর ভাঙ্গা ছিল। আল্লাহরও হেদায়াত দেয়ার ছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ কালেমা পড়াতে প্রস্তুত ছিল না। কেউ তাকে বললেন, আপনি ফুলাতে চলে যান। তিনি ফুলাতে এলেন। আমি বাসা থেকে বের হচ্ছিলাম দেখি একটি টয়োটা গাড়ি থেকে একজন বের হলো লোকটিকে দেখে শিক্ষিত মনে হল। খুব আবেগের সাথে বলছিল ইসলাম গ্রহণ করতে চাই, আপনি মুসলমান বানাতে পারবেন? পারলে তো ঠিক আছে না হয় আপনিও বলে দিন পারবো না। আমি ধারণা করলাম মনে হয় লোকটি বিভিন্ন স্থান থেকে ঘুরে এসেছে। আমি বললাম আপনি কি দাড়িয়ে কালেমা পরবেন না বসে ? বলল, বসে পড়ব। কালেমা পড়ালাম তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনাকে কে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে? বললেন আমাকে কোনো মানুষ ইসলামের দাওয়াত দেয়নি। আমাকে ইসলাম নিজে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে। আমি

বললাম, আচ্ছা ! আপনাকে ইসলাম নিজে দাওয়াত দিয়েছে? তার বিস্তারিত জানলাম।[১২]

জিজ্ঞাসা করা হলো, আরমুগানের পাঠকের জন্য আপনি কোনো পয়গাম দিবেন? তিনি বললেন, কথা খুব তিক্ত, কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয়, তাই বলছি। তৃষ্ণার্ত মানবতার কাছে যদি আপনি কুরআন ও ইসলাম- এর পয়গাম না পৌঁছাতে পারেন, তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে ইসলাম ও কুরআনের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। আমার বন্ধুগণ! অবস্থা তো হলো এই আমরা ইসলামের দাওয়াত দিবো তো দুরের কথা, আমাদের দাওয়াতী সেন্টারে এমন অনেক লোক আছেন, দুই-তিনদিন পর পর এমন অনেক লোকও আসতে দেখা যায় যারা বলে আমরা অমুক লোকের কাছে গিয়েছিলাম তিনি আমাদেরকে মুসলমান বানাতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। বলেছে, এটা খেলা নয়। সমাজের সাথে লড়তে পারবো না। আপনি কারো প্ররোচনায় এসে গেছেন, এমন সিদ্ধান্ত কখনো ঠিক হবে না। মালিক যদি আপনাকে মুসলমান বানাতে চাইতেন তাহলে মুসলমানের ঘরে জন্ম দিতেন। এমন অনেক মানুষ পাওয়া যায় যে কোনো মুসলমানের অধীনে চাকুরী করে, কোনো কোনো যুবক কর্মচারী ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে, তাকে মুসলমান বানায় না, কারণ মালিক মনে করে আমার উপর আবার কোনো বিপদ চলে না আসে। নাজানি কোনো সমস্যায় পড়ে যাই। তাই সেই আগ্রহী কর্মচারিকে ইসলাম গ্রহনে বাধা দেয়। অনেক সময় তো মারপিটও করে। আমাদের সামনে এমন অনেক ঘটনা আছে।

আমরা দিল্লিতে থাকি ওখানে আজমগড়ের এক হাজী সাহেব স্টোরি চালান। ওখানে নেপালের এক যুবক ছিল, তার নাম ছিল সাগর। খুব সুন্দর ছেলে ছিল। ছোট বাচ্চা আসজাদের হাতে ইসলাম কবুল করে সে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করে। একদিন নামাজ পড়ে ফিরার সময় হাজী সাহেব দেখে ফেলে। হাজী সাহেব বললেন, কিরে তোর মাথা খারাপ

[১২] "আলোর পথে সিরিজ-হিন্দু থেকে মুসলমান" বইয়ে উনার সাক্ষাৎকার ছাপানো হয়েছে।

হয়ে গিয়েছে নাকি, তুই কি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাস ? কোথায় গিয়েছিলি ? এটা ওটা বলে সে হেসে কথা উড়িয়ে দিল; বলল, না কিছু না। দুই-তিন দিন পর আবার সাগরকে নামাজ পড়তে দেখে হাজী সাহেব বললেন, সাগর তোকে তো নিষেধ করে দিয়েছিলাম, তুইকি এখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবি ? তুই এখানে কেন আসিস ? সে ভাবল হাজী সাহেব খুশি হয়ে যাবে, তাই বলে দিই। সে বলল, আমি গত মাসে আসজাদের হাতে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছি। তা শুনে হাজী সাহেব রেগে গেলেন, বললেন, কেউ যদি জেনে ফেলে তাহলে তোর ফ্যামিলির লোকেরা আমাদের উপর রেগে আসবে। কে যাবে তাদের সাথে লড়তে! ধমকাতে লাগল। দুই-তিন দিন পর সে আবার নামায পড়তে এলে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই তাকে কয়েকটি থাপ্পর দিল, মারপিট করল। সে বলল, হাজী সাহেব আপনার এই প্রহারের কারণে ইসলাম ভিতর থেকে বের হবেনা। ইসলাম অন্তরে প্রবেশ করে ফেলেছে। তিনদিন পর জুমার দিন ছিল। জুমার নামায আদায় করে ফেরার সময় হাজী সাহেব তাকে বললেন, সাগর বুঝে আসেনি? ছোট্ট বাচ্চার কথায় কালেমা পড়ে নিলি, তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? সে বলল, হাজী সাহেব আপনার ধমকের দ্বারা ইসলাম বের হবেনা। আর বলেছিলাম, ইসলাম আমার পশমের গোড়ায় গোড়ায় ছেয়ে গিয়েছে। হাজী সাহেব জুতা খুলে জুতা দিয়ে পিটাতে লাগল জুতার লোহার খিল লেগে থাকার কারনে তার কয়েক স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। হাজী সাহেব বললেন, রাত ১২ টা পর্যন্ত সময় দিলাম। এর মধ্যে হয় ইসলাম থেকে ফিরে আসতে হবে, না হয় তোকে বের করে দিব। একমাসের বেতনও কেটে রাখব। তোকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিব। সে কেন মুসলমান হলো এই জন্য রাত বারোটার সময় তাকে বের করে দেয়, সময়টা ছিল জানুয়ারির ভরা শীতের সময়। রাতে কুয়াশা পড়লো, বৃষ্টিও হলো। তার সামানা নিক্ষেপ করে বের করে দিয়েছে। সে বলে, হে আল্লাহ্ ! আর কারো কাছে হাত সম্প্রসারিত করবো না।

আমরা আমাদের মাথায় একটি আকৃতি ধারণ করে রেখেছি যে, এরা তো ভিন্ন জাতি। আমাদেরকে দায়ী বানানো হয়েছে। নবীদের সিরিয়াল শেষ হওয়ার পর যেই নবীকে সারা পৃথিবীর জন্য রহমত হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। আর আমাদের দায়িত্ব ছিল এই রহমতকে বন্টন করা। আমরা কি করেছি? আমরা কি তার হক আদায় করেছি? আমাদের হযরত বলতেন, দা'য়ীর অবস্থান হলো ডাক্তার আর মাদউর অবস্থান হলো রোগীর। আমাদের সম্পর্ক হলো ডাক্তার আর রুগীর। মানবতার হসপিটালের অবস্থা হলো এই যে, ডাক্তার তার রুগীর প্রতি বদধারণা করছে। রুগী তার ডাক্তারের প্রতি ভুল ধারণা পোষণ করছে। রুগী ডাক্তারকে মনে করছে সন্ত্রাস, খারাপ, মুর্খ। আর ডাক্তার তার রুগীকে বলছেন, এরা ভিন জাতি, দুশমন, প্রতিপক্ষ। এরা ভিন জাতি। আরো বলি, এরা কাফের। অধিকাংশ সময় এমন গ্রাম এলাকায় কেউ মুসলমান হলে তাকে নিয়ে মসজিদে আসলে মানুষ বলাবলি করে, খুব ইসলাম প্রচার করছে, কাফেরকে এনে মসজিদ নাপাক করে ফেলেছে। এ ধরণের কথা বলে, অনেক সময় মসজিদে আসতে দেওয়া হয় না।

কিছুদিন পূর্বে আমাদের এক সাথী আনোয়ার ভাই মাওলানা কাসেম সাহেব রহ. -এর সাথে কাশ্মিরের সফরে ছিল। তিনি চিন্তা করলেন হযরত বিল এর মাযারে একটু ঘুরে আসি। সেখানেই মাগরিবের সময় হয়ে গেলো, আনোয়ার ভাই বলেন, আমরা চিন্তা করলাম, এখানেই মাগরিবের নামায আদায় করে নিই। আর মাগরিবের সময় দরগা দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। মানুষজন বের হচ্ছিল। একটি কাফেলা আসলো তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল তাদেরকে দেখা গেল। আজানের সময় মহিলারা মাথায় কাপড় টেনে ঘোমটা দিচ্ছিল, আর পুরুষরা মাথায় রুমাল রাখছিল। আর আল্লাহু আকবার শুনে বলছিল মালিক আপনি বড়। মালিক আপনি বড়। খুব শ্রদ্ধার সাথে হাত জোর করে বলছিল। আনোয়ার ভাই দাওয়াতের ফিকির রাখে, তাই তিনি ভাবলেন তাদেরকে দাওয়াত দেয়া যাক। তিনি কিছু সময় দাওয়াত দেওয়ার পর তারা ইসলাম কবুল করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। মুসলমান হয়ে যায়। মাওলানা কাসেম সাহেবের ছেলে মাও.রাশেদ সাহেবকে বললেন মাওলানা এদেরকে ওযু করানো দরকার। নামায পড়ানোর প্রয়োজন। তাদেরকে যখন ওযুখানায় ওযু করানোর জন্য নিয়ে গেলেন, তখন গ্রামের লোকজন বলতে লাগল, এরা তো নাপাক,

ওযুখানাকে নাপাক করে ফেলবে। উনারা বললেন তারা তো মুসলমান হয়ে গেছে। লোকেরা বললো, হ্যাঁ, আমরা জানি বিড়াল সত্তর বার ইঁদুর খেয়ে হজ্জে যায়, আমাদের জানা আছে কেমন মুসলমান। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে মসজিদে যেতে দেয়নি। আনোয়ার ভাই বলল, একজন যুবক একাকি গিয়ে নামাযে দাড়িয়ে গিয়েছিল, নামাযের পর তার অবস্থা দেখার মতো ছিল। সে জমিতে বিলাপ করছিল আর বলছিলো রব্বা রব্বা আপনি কতদিনে আমার সাথে দেখা করলেন। আমরনাথ ও বিষ্ণুদেবী আরো কত স্থানে ধোঁকা খেতে হয়েছে। মালিক আপনাকে এখানে পাওয়ার ছিল তাহলে আগে আমাকে ধরা দিলেন না কেন? এমন বলছিল আর কান্না করছিল। যাকে আমরা মনে করি -এটা হবে, ওটা হবে ইত্যাদি।

আমার বন্ধুগণ! আমরা বিজাতিদেরকে দুশমন মনে করছি। রোগী-ডাক্তারের প্রতি ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে। এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় না। রোগী পাগল হতে পারে, কঠিন ব্যথার কারণে কখনো কখনো লাথি মারে, জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলে, বমি করে দেয়। রোগীর চিকিৎসা না হয়ে রোগী যদি মারা যায়, তাহলে রোগীর পরিবার যদি আন্দোলন করে তাহলে এটাও অপরাধ নয়। এর অনুমতি আছে। কিন্তু রোগী থেকে বিমুখ হওয়ার কোনো সুযোগ ডাক্তারের নেই। এই জাতি বিশেষ করে হিন্দুস্থানের জাতি খুবই ভালোবাসা ও মহব্বতওয়ালা জাতি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হিন্দুস্থানের মাটি থেকে ভালোবাসার সুঘ্রাণ আসছে। দাওয়াতের ময়দানে গেলে বুঝতে পারবেন এরা কেমন মহাব্বতওয়ালা জাতি। আমার স্নেহাস্পদ কলফিওয়ালা- এর কবিতা বলেছিল, কথাটি খুবই বাস্তবসম্মত।

কাছে এসেই তো বুঝতে পারবে আমায়
এই দূরত্ব তো ভুল ধারণা বাড়ায়।

অধিকার আদায় করার ধারণা আমাদের মাথা থেকে শেষ হয়ে গেছে। তাদের হক আদায় করার জন্য তাদের কাছে যাইনি। তাদের হক নষ্ট করছি আমরা। ফলে মনে হচ্ছে তারা জেনে বুঝে আমাদের সাথে এমন করছে। ডাক্তার যদি রুগীকে অপর মনে করে তাহলে অবস্থাতো এমনই হবে। সাহারনপুরে দাওয়াতি ক্যাম্প লেগেছিল। আমি সাথিদেরকে বলেছিলাম শায়খুল হাদিস রহ. -এর বংশের লোকদেরকে যেন অবশ্যই দাওয়াতি প্রোগ্রামে জোড়ানো হয়। যাতে এই বিষয়ে মানসিকতা তৈরী

হয়। শায়েখের বংশের দুইজন যুবককে সাথে নিয়ে তারা দাওয়াতে বের হলো, সেখান থেকে বের হতেই এক লালাজীর দোকানের দিকে যাচ্ছে, মাজাহেরুল উলুম মাদরাসার একজন উস্তাদ যিনি খুবই বড় বুজুর্গ। ছাত্রদের সাথে খুব মমতাপূর্ণ আচরণকারী আলেম, আমাদের আকাবির উলামাদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি কেবল তিরমিযী শরিফের ক্লাশ করিয়ে বের হলেন, দেখলেন তারা সেই লালাজীর দোকানের দিকে যাচ্ছে, তাদেরকে ডেকে মহাব্বতের সাথে বললেন, এই দোকানে যেও না কারণ এ হলো গোয়েন্দা, আরএসএস এর লোক। মাদরাসার সামনে দোকানদারী করে। তার কাছে যেওনা। আমাদের সাথী বললো, হযরত হোক না কিছু কিন্তু সে তো আমারই ভাই। আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন। এই বলে তার কাছে চলে গেলো, গিয়ে কথা শুরু করে দিল। মাওলানা সাহেব দশ মিনিটের মতো দেখতে লাগলেন যে কোনো সমস্যা হলে গিয়ে বলবেন এরা ছেলে মানুষ মহব্বতের সাথে এসে গেছে। কোনো অসুবিধা নেই। সেখানে গিয়ে সাথীরা দাওয়াত দিতে লাগলো, দশ বারো মিনিট পর দেখতে পেলেন লোকটি কাঁদছে। মাওলানা সাহেব ভাবলেন কি যেন বলেছে, তাই তিনি দোকানের দিকে এগিয়ে গেলেন। লোকটি বলছিল, আমার বাবা এখানে দোকান করেছিল, আমার দাদা এখানে দোকান করেছিল, তারা আলেম উলামাদের মাঝেই দোকান করেছিল। তারা তো কালেমা পড়েনি তাদের কি অবস্থা হবে। কেউ তো তাদের ব্যাপারে কোনো ফিকির করেনি, কেউ তাদেরকে ইসলামের কথা বলে নি। তারা চিরকাল নরকে জ্বলবে, তাদের কি অবস্থা হবে। লোকটি বলল, আমি আপনাদেরকে একটি কথা বলি, আমার বাবা যখন মৃত্যুর শয্যায় শায়িত, তাকে খাট থেকে মাটিতে রাখা হলো, তখন বাবা আমাকে ডেকে বললেন, বিনোদ আমি তোমাকে শেষ একটি ওসিয়ত করছি, এই কথাটি মনে রাখবে, আমল করবে। তাহলো, দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে লাভ নিও কিন্তু মাদরাসার ছাত্রদের থেকে লাভ নিও না। তাদের সেবা করবে। তাহলে তোমার ঘর ভরে যাবে। আমার বাবা মৃত্যুর সময় এই সব কথা বলে যাচ্ছিল। এরা আল্লাহওয়ালা লোক এদের কাছ থেকে লাভ নিও না। তুমি যদি তাদের কাছে থেকে লাভ না নাও, তাদের সেবা কর তাহলে মালিক তোমার ঘর ভরে দিবেন। আমরা মনে করি গুপ্তচর। আর সে মৃত্যুর সময়

তার ছেলেদেরকে ভালোবাসা নসিহত করে যাচ্ছে। প্রায় সব স্থানে একই অবস্থা।

বন্ধুগণ! এরা কেমন লোক তাদের কাছে গেলে বুঝা যাবে, এরা কেমন মুল্যায়নকারী জাতি। আমরা তো তাদের কাছে ইসলাম পৌঁছাইনি। যারা বিরোধিতা করছে, শুত্রুতা করছে, এরাতো রোগী। আমরা যদি অল্প একটু তাদের হক পৌছাতাম তাদের চিকিৎসার ব্যাবস্থা করতাম, তাহলে সকলেই ডাক্তার হতো। যাদেরকে আমরা দুশমন মনে করি যাদেরকে মনে করছি এটা তাদের চক্রান্ত, তাদের পর্যন্ত দাওয়াত পৌঁছেনি। বল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সফল হয়ে যাবে"। এটা আমরা পৌছাইনি। গত বছর ১৪ যিলহজ্জ আমি রাওযায়ে আতহার থেকে ছালাম দিয়ে বের হচ্ছিলাম। এক আলেমে দ্বীন, যিনি হারামের ভি.আই.পি মেহমানদেরকে মিলিয়ে দেয়, তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, যে, কালিম সাহেব ! একজন কাজের লোকের সাথে আপনাকে সাক্ষাত করিয়ে দিবো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কার সাথে সাক্ষাৎ করাবেন? জানতে পারলাম ছোট ছোট দাড়ি ওয়ালা শ্যাম বর্ণের একটি লোক দাড়িয়ে আছেন। তিনি হলেন আব্দুল আজিজ জেমস। আমি বললাম, সুইজারল্যান্ডের আব্দুল আজিজ জেমস ? আমি তার ব্যপারে ইন্টারনেটে পড়েছি। তিনি ঐ ব্যক্তি যিনি ডেনমার্কে নবীজীকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন বানিয়ে ছিল সেই কার্টুন যিনি তার পত্রিকায় সুইজারলেন্ডে বার বার ছাপিয়ে ছিলো। এর অনেক মার্কেটিং করেছিল। তিনি ওখানে সুপ্রিমকোর্টে একটি মামলা করেছিলেন, এই দেশ যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ দেশ তাই মসজিদ তো একেবারে বন্ধ করা যায় না। তাই মসজিদের মিনারগুলো শহরের সৌন্দর্য্য নষ্ট করছে তাই এই মিনারাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হোক। পরিশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাকে কেউ দাওয়াত দেয়নি। তিনি কুরআনের বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ লিখতে চেয়েছেন, কিন্তু যখন কুরআন পড়া শুরু করলেন, আল্লাহ তাআলার হেদায়াত দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তাই তিনি হেদায়াত দিয়ে দিয়েছেন। ইন্টারনেটে তার অভিমত আমি পড়েছি। তিনি লিখেছেন- আমি আল্লাহ ও তার রাসূল এবং সকল মুসলমানদের কাছে আন্তরিক ভাবে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি আল্লাহর হক্বের মিনারাকে শহরের অ-সৌন্দর্য বলেছিলাম। আর আমার মুহসিন নবীজীর শানে মন্দ আচরন করেছি। তাঁর মানহানি করেছি। কিন্তু আমি এ কথা স্পষ্ট বলতে পারি যে, আমার এই অপকর্মের কারণ

আমার থেকে ঐ মুসলমানদের বেশী যারা আমার সাথে আমার আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো পরিচয় করায় নি। আর আমার নবী থেকে আমাকে দূরে রেখেছে। আমি দেখলাম তিনি রওযায়ে আতহার থেকে বের হয়ে এলেন এবং উনার চোখ থেকে পানি ঝরঝর করে বের হচ্ছে, আর তার চোখ লাল হয়ে আছে, চোখের পানিতে মুখ ভিজা। তিনি বলছিলেন আমি আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর রওযায়ে আতহারে খুব কাঁদছিলাম আর আমি খুব লজ্জিত অপমানিত ও অনুতপ্ত হয়ে বলছিলাম, হে আমার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম! আমি আপনার কাছে আমার পাপের, ও মন্দকর্মের ও অপরাধের কোন ভাষায় ক্ষমা চাইবো তা বুঝছি না। তবে আমি আমার আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা করছি, আমার জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমার সকল মাল ও জান এবং আমার ম্যাগাজিন আপনার দীনের এবং সুন্নাতকে মানুষের পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য খরচ করব।

এই জন্য আমি বলেছি, অপরাধ শুধু সেই ইসলাম বিদ্বেষী ইসলামের অপমানকারী নয়, সত্য কথা হলো দাওয়াতের হক আদায় না করা এবং ঐ বেচারাদের গাফলতের কারনে আমরা হক নষ্টকারী অপরাধী ডাক্তার। আমরা যদি তাদের হক আদায় করতাম, আর তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূল রাহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সাথে পরিচয় করাতাম, তাহলে চুড়ান্ত পর্যায়ে উদাসীনতায় বিরোধিতাকারী ও দুশমনী রাখে এমন অনেক রোগী উত্তম ডাক্তার এবং ইসলামের ধনভান্ডার বন্টনকারী দা'য়ী এবং কায়েদ হওয়ার কথা ছিলো, আমাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে উদাসীনতার মতো অপরাধের সত্যের যখন কোনো ভাই কোথাও থেকে কোনো ভাবে ইসলামের ছায়াতলে আসে সেই দা'য়ী হয়ে যায়। প্রয়োজন হলো আমরা যেন হক আদায়কারী হয়ে যাই। যদি আমরা হক আদায় না করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের বিরুদ্ধে অন্য এক জাতি দাঁড় করাবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।[১৩]

[১৩] মুহাম্মদ-৩৮

আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব আদায় না করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের হেদায়াতের জন্য এমন লোককে দাঁড় করাচ্ছেন যে এক সময়ের বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারী, আর এখন বড় দা'য়ী এবং মসজিদ নির্মানকারী হয়ে যাচ্ছে। এর সাথে এও হচ্ছে, ইসলাম বিরোধীরা ইসলাম গ্রহণ করছে, দীনের দায়ী হচ্ছে। অন্যদিকে বংশীয় মুসলমান ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হচ্ছে মুরতাদ আর ইসলাম বিদ্বেসী। يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا এর ক্ষেত্রে মিসদাক হচ্ছে। আমাদেরকে 'তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন,' এর সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে। এখন তো আংশিক পরিবর্তন, একদিকে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে আর অপরদিকে মানুষ মুরতাদ হচ্ছে। আমরা যদি দাওয়াতের দায়িত্বের হক আদায় না করি, হতে পারে সামষ্টিকভাবে সকল মুসলমান থেকে ইসলাম ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আর অন্যদেরকে দাওয়াতের জিম্মাদার বানিয়ে দেওয়া হবে। সামষ্টিকভাবে দাওয়াতকে ছেড়ে উদাসিনতার কারনে আমাদেরকে অপরাধী করে অন্য এক জাতিকে এই মানসাবে বসাবেন। সকল মানবতার হক আদায় করে আমাদের প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর আনুগত্য অন্যের ভালোবাসা কল্যাণ কামনা করা এবং সকল মানুষের কাছে তাদের হক আদায় করা উচিত।

থানবী রহ. -এর একটি বাণী

সর্বশেষে হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলনা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর একটি বাণী বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। তিনি একবার ভরা মজলিসে বললেন, আমি পুরো ইসলামকে দুইটি শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করতে পারবো। উপস্থিত উলামায়ে কেরাম বলেন, বলুন হযরত! তিনি বললেন, "হক আদায় করা"। এটা সমস্ত বুযুর্গ তাসাউফ, বুযুর্গদের মালফুজাত। এটা দীনের সারমর্ম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হক আদায় করা এবং হক নষ্ট করার অপরাধী থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। আমিন

শত্রুকে বন্ধু বানানোর পদ্ধতি

আজ সারা বিশ্বের মুসলমানরা একটি বিষয়ে খুবই চিন্তিত ও অস্থির। এই সমস্যা একেবারে সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষকেও অস্থির বানিয়ে রেখেছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য যতই চেষ্টা তদবির করা হচ্ছে সবই উল্টে যাচ্ছে।

এমন মনে হচ্ছে যে পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিস এমনকি আসমান জমিনও মুসলমানের শুত্রু হয়ে গিয়েছে। আমার হযরত ওয়ালা হযরত মাওলানা আলিমিয়া নদভী রহ. বলতেন, এই যুগে এমন দুটি জাতি আছে, যাদের ধর্মীয় ভিত্তিতে চুড়ান্ত পর্যায়ের দুশমনি পাওয়া যায়। তারা ইতিহাসে প্রথমবার মুসলমানের দুশমনির ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে- ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান। তারা পরস্পর ধর্মের ভিত্তিতে দুশমনি রাখে। নাউযুবিল্লাহ! ইয়াহুদীরা মারয়াম আ.-কে অপবাদ দেয়। তার প্রতিফলন দেয় ঈসা আ. এর উপর। আর খ্রিস্টানরা মারয়াম আ. ও ঈসা আ. -কে আল্লাহর মত মর্যাদা দেয়। আল্লাহর বিবি ও আল্লাহর সন্তান বানিয়ে শিরক করা শুরু করে দিয়েছে। ধর্মীয় ভাবে তাদের মধ্যে এতো বিরোধ ও দুশমনি থাকা সত্যেও তারা মুসলমানদের দুশমনির ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ। এর সাথে সাথে দুনিয়ার সকল জাতি ও তাদের সকল শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যয় হচ্ছে। তাদের দুশমনি শেষ করার জন্য মুসলমানদের পক্ষথেকে কতো চেষ্টা করা করা হচ্ছে। তাদের খোশামদি এবং কত ধরণের চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু ফলাফল একে বারে জিরো। বরং দুশমনি আরো বেড়েই চলছে। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষ অস্থির এবং সমাধানও হচ্ছে না। আমাদের সকল সমস্যাগুলোর কারণ হলো আমরা আমাদের রোগের এবং মুসিবতের সমাধান এবং চিকিৎসা, প্রকৃত ডাক্তার এবং বিপদমুক্তি থেকে উত্তরণে পবিত্র কোরআনের পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন ছাড়া আমরা দুনিয়ার অমুক-তমুক পন্থার কাছে অনুসন্ধানে লিপ্ত রয়েছি। ফলশ্রুতিতে অন্ধকারের মধ্যে আরো বেশি অমাবশ্যার আকার ধারণ করছে। আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছি। প্রকৃত ডাক্তার এবং

বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা পবিত্র কোরআনে সমস্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের এবং শত্রুতাকে-বন্ধুত্বে পরিণত করার একটি অভিজ্ঞতাসূলভ ট্রিটমেন্ট (উপশম) এবং তীর লক্ষ্যভেদ করার মতো একটি পন্থা বাতলে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?[১৪]

আয়াতে শুরুতেই বলা হচ্ছে এবং এটি আয়াতের প্রধান চুম্বকাংশও যে, তার কথার চাইতে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে। নিজের পথ-মত, নিজের মাসলাক নিজের দল, নিজের সংগঠন, নিজের প্রিয় নেতার দিকে নয়, সরাসরি আল্লাহর দিকে। গায়রুল্লাহ থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে বের করে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়। এবং নেক আমল করে, এবং তার এই নেক আমলে এটা প্রমাণ পেশ করে যে, যেই উত্তম ও ভালোর দিকে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি, আমার আমল ও ভালো কাজ তার সাক্ষি। অর্থাৎ ঐ ভালো কাজকেই আমি আমার নিজের নাজাত-মুক্তির জন্য ভিত্তি মনে করি। এবং বলে وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ - যে, যেই আল্লাহর আনুগত্য এবং বশ্যতার কথা বলে বেড়াচ্ছি, আমিও প্রথমেই আমার গর্দান এবং আমার মাথা ঐ উচু সত্তার সামনে সমর্পণ করছি। وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ভালো এবং মন্দ কখনো এক হতে পারেনা। ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ মন্দ মন্দকে দূর করতে পারেনা। নাপাকী বা অপবিত্রতা অন্য অপবিত্রতাকে দূর করতে পারে না। তেমনি অন্ধকার অন্ধকারকে দূর করতে পারেনা। চক্রান্ত কখনো শত্রুতা আর দুশমনী দ্বারা শেষ হওয়ার নয়। বরং মন্দ ভালোর দ্বারা, অপবিত্রতা পবিত্রতা দ্বারা, অন্ধকার আলোর দ্বারাই কেবল দূর হতে পারে।

---

[১৪] হামীম সেজদা-৩৩

ঠিক তদ্রুপ চক্রান্ত এবং শত্রুতা কল্যাণকামীতা দ্বারা খতম হতে পারে। সুতরাং যখন তোমাদের সাথে দুশমনি এবং অনিষ্টতা করা হয়, মানুষ তোমার বিরুদ্ধে শত্রুতা-চক্রান্তে লিপ্ত, তখন তোমরা এই অনিষ্টতাকে ভালো (ঐ জিনিস দিয়ে যা সর্বোত্তম) দ্বারা প্রতিকার করো। লোক তোমাকে শিরকের উপর বাধ্য করছে, বন্দে মাতরম, এবং নমস্কারের জন্য মজবুরি করছে, তখন তুমি তাকে এক আল্লাহর ইবাদাত-উপাসনা এবং জান্নাত- স্বর্গের রাস্তার দিকে আহ্বান করো। তখন ফলাফল আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী কী দাঁড়াবে?

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। [১৫]

আল্লাহ ইরশাদ করেন وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্য আর কার কথা হতে পারে?[১৬] আল্লাহ বলেন, তারা তোমাদের চূড়ান্ত দুশমন, তোমার প্রতিপক্ষ বন্ধুতে পরিণত হবে। আয়াতে এবং তার প্রভাব বলার সাথে সাথেই কিছু নির্দেশনা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সতর্কতা স্বরূপ ইরশাদ হচ্ছে- وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।[১৭]

এই আয়াতের ব্যবহার এবং তার থেকে ফায়দা উঠানো সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এবং আয়াতের স্বাদ এবং তার উপকার ভোগ করা কেবল ঐ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যে ধৈর্য্যশীল এবং ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা রাখে। এবং

[১৫] হামীম সেজদা-৩৪

[১৬] নিসা-৮৭

[১৭] হামীম সেজদা-৩৫

আরবীতেই 'সবর' এর অর্থ শুধুমাত্র মুসিবত এবং কষ্ট সহ্য করাকে বুঝায় না, বরং আপনার আশা, চাওয়া-পাওয়া (কামনা-বাসনা) বিবেকের বিপরীত দেখেও নিজের উত্তম এবং ভালোর উপর দৃঢ় চিত্তে প্রতিষ্ঠিত থাকা।

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[১৮]

তারপর ইরশাদ হচ্ছে, শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, সে তোমাদের মানুষকে দোযখ-নরক থেকে বাঁচানো এবং মানুষকে উত্তমের উপর চলার পথে নিশ্চিত বাধা প্রদান করবে। এবং বলবে, তুমি কি তোমাদের মায়ের দুধ পান করোনি? 'তুমি কি মিথ্যা' পিতার সন্তান? ইটের জবাব পাথর দ্বারা দাও, থাপ্পরের জবাব ঘুষি দ্বারা দাও, সুতরাং শয়তান যখন তোমাদেরকে কল্যাণকামিতা এবং তার দাওয়াত থেকে হটানো এবং ঝগড়া - ফাসাদের প্রবঞ্চনা দিবে, তখন তুমি فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। আল্লাহর নিরাপত্তার ছাউনীতে আসো এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করো, তিনিই (আল্লাহ) তো সবচেয়ে শ্রবণশীল এবং সবচেয়ে জ্ঞানী।

শত্রুকে বন্ধুতে রূপান্তরিত করার তীর লক্ষ্যভেদ করার মতো এই আয়াত স্বয়ং জগতের প্রতিপালক সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম সংবিধান কুরআনে কারীমে এরশাদ করেছেন। আমাদের মধ্যে সকলেই ঈমানদার হওয়ার দাবিদার। অর্থাৎ আমরা এই দাবি করে যে আমরা আল্লাহ তাআলা যা কিছু বলেছেন, তা আমরা এমন ভাবে মানি যা নিজের চোখের দেখা জিনিস থেকেও বেশী বিশ্বাস করি। এবং তাকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করি। আমরা যদি আমাদের দাবিতে সত্যবদি হয়ে থাকি, তাহলে বর্তমান যুগে যখন সকল জাতি ও শক্তি এক হয়ে মুসলমানের শত্রু হয়ে গিয়েছে আর

[১৮] হামীম সেজদা-৩৬

আমরা সকল ঈমানদারগণ তাদের শত্রুতা মোকাবেলা করতে গিয়ে অপারগ ও ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি। সকল শত্রুদের শত্রুতার রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দাওয়াহ ইলাল্লাহর নুসখাকে ব্যবহার করা উচিত। যদিও পূর্ব থেকে কোনো একজনও এই পদ্ধতি ব্যবহার করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেখেনি। কারণ প্রকৃত চিকিৎসক আহকামুল হাকিমীন তার পবিত্র কালামে পাকে এর প্রভাবের সনদ দিয়েছেন। পুরো মানবতার ইতিহাসও তার সাক্ষি দেয়। যখনই মুসলমান দাওয়াহ ইলাল্লাহর এই নুসখাকে ইসলাম ও মুসলমানের দুশমনির চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করেছেন, এমন একটি ঘটনাও নেই যাতে তারা সফল হয়নি।

আসুন! আমরা চৌদ্দশ বছর পূর্বে খাইরুন কুরুনে চলে যাই এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলো দেখি। কে ছিলেন ওমর বিন খাত্তাব? তিনি তো মক্কার ঐ বাহাদুর ছিলেন যার সামনে কোনো বাহদুর দাঁড়াতো না। নিজ ঘর থেকে নাঙ্গা তরবারী নিয়ে বের হলেন যে নিত্যদিনের এই আলোচনা ইসলামের কথা শুনতে শুনতে অপারগ হয়ে গিয়েছেন। পুরো মক্কায় শোর মচে গিয়েছে। আজ ওমর দারুল আরকাম যাচ্ছে আর নাউযুবিল্লাহ গর্দান থেকে মাথা পৃথক করে দিবে। যার কারণে মক্কায় হই চই লেগে গিয়েছে। পুরো মক্কায় আনন্দের বর্ণা বেয়ে যাচ্ছে। আনন্দ করা হচ্ছে আর বলা হচ্ছে আজ ওমর জোশে এসে গিয়েছে। আজ ওমর দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আজ এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আজ ইসলামের প্রদীপ নিভে যাবে।

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।[১৯]

পুরো মক্কায় আনন্দ ফুর্তির জন্য সভা বসানোর প্রস্তুতি চলছে, তৈয়ার

[১৯] তাওবা-৩২

হচ্ছে বিভিন্ন আয়োজন। এই কঠিন বাহাদুর, ইসলামের একমাত্র দুশমন, ওমর বিন খাত্তাবের মুখে তার বোন সুরা ত্বাহার একটি আয়াত পড়ে দাওয়াত ইলাল্লাহর একটি খোরাক রাখলেন। তো যেই ওমর বিন খাত্তাব দারুল আরকামের দিকে যাচ্ছিলো রহমাতুল্লিল আলামিনের গর্দান নেওয়ার জন্য, তাকে হত্যা করার জন্য, সেখানে ইবনে খাত্তাব ওমর ফারুক রা. হয়ে গেলেন। আমার পর যদি কোনো নবী হতো তাহলে ওমর হতো। এই ফরমানে নববীর অধিকারী হয়ে গেলেন। এই ওমর যে মক্কা থেকে নাঙ্গা তরবারি নিয়ে বের হয়েছিল, দারুল আরকামে গিয়ে নবীয়ে রহমেতুল্লিল আলামিনকে হত্যা করতে গিয়েছিলো, নবীর রক্তের দুশমন হয়ে গিয়েছিলো। দাওয়াত ইলাল্লাহর একটি খোরাক দ্বারা এমন হয়ে গিয়েছিল যে; মুহাদ্দিসগন লিখেছেন যে, যখন মদিনায় নবীজীর মৃত্যুর সময় পুরো মদিনায় শোকের ছায়া বিস্তার করলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য যিনি নাঙ্গা তরবারী নিয়ে বের হয়েছিলেন, সেই ওমর বিন খাত্তাব রা. মসজিদে নববীর দরজায় দাড়িয়ে গেলেন। তরবারী ঘুরিয়ে বলতে লাগলেন, যে ব্যক্তি বলবে আমার প্রিয় এন্তেকাল করেছেন, আমি তার মাথাকে তার গর্দান থেকে পৃথক করে দিব। মুসা আ. যেমন তুর পাহাড়ে গিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে দেখা করতে। তেমনিভাবে আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাথে দেখা করতে গিয়েছেন। যারা নবীর এন্তেকালের খবর ছড়াচ্ছে, ফিরে এসে তাদের ভুল ধারণাগুলো দূর করবেন। নবীজীর সাথে তার এমন গভীর সম্পর্ক ছিল যে তিনি তাঁর মৃত্যুর খবর সহ্য করতে পারছিলেন না। কেনই বা হবে না। কারণ দাওয়াত ইলাল্লাহর চিকিৎসায় শত্রুতার যে রোগ ছিল, তা প্রশমিত হয়েছে। فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ তার মাঝে ও তোমার মাঝে যদি শত্রুতা থাকে তাহলে তা অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিনত হয়ে যাবে। [২০]

[২০] হামীম সেজদা-৩৪

খালেদ বিন ওয়ালিদ কে ছিল? তিনি ছিলেন মক্কার বড় বাহাদর ও সিপাহ সালার। উহুদ যুদ্ধে বাহ্যিক ভাবে মুসলমানের বিজয়ের পর পরাজয়ের কারণ ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদের যুদ্ধ কৌশল। মুসলমানদেরকে এতো কষ্ট সহ্য করতে হয় যে সত্তর জন জানবাজ সাহাবীর শাহাদত বরণ করতে হয়েছিল। সাইয়্যেদানা হামজা রা. কে কত নির্দয়ভাবে শহিদ করা হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান্দান মুবারক শহিদ হয়েছে। উহুদের খোলা পাহাড়ে নাঙ্গা তরবারী নিয়ে ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চিৎকার করছিল আর বলছিল, নাউযুবিল্লা মুহাম্মদ যদি আমার তরবারি থেকে বেচে যায়, তাহলে বুঝতে হবে ইসলামকে পরাজয় করার কোনো শাহস থাকবে না। এই খলিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর মুখে যখন দাওয়াতের একটি খোরাক দেওয়া হলো তখন তিনি এবার কে হলেন? তিনি হলেন সাইফু মিন সুয়ুফিল্লাহ (আল্লাহর তরবারীর মধ্যে একটি তরবারী) উপাধিতে ভুষিত হলেন। ইসলামী জেনারেল এবং সিপাহ সালার ফাতেহ বিজয়ী খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.। এই খালিদ বিন ওয়ালিদ যিনি ইসলামের ও পয়গাম্বরের শত্রুতায় ও রক্ত পিপাসায় উহুদের পাহাড়ে নাঙ্গা তরবারি ঘুড়িয়ে ছিল, চিৎকার করছিল, দাওয়াত ইলাল্লাহর একটি খোরাকে এমন আশেকে রাসূল হলো, মৃত্যুর কিছুদিন পুর্বে তাঁর এক সাহাবী-সাথীর সাথে খুব আফসোসের সাথে বলছিলেন, আমার পুরো জীবন এই আফসোসে কেটে গেল যে আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক মন ভরে দেখব, কিন্তু মহব্বত ও আদবের কারণে তার পবিত্র চেহারার প্রতি তৃপ্তির সাথে তাকাবো সেই সাহস হয়নি।

ওয়াহশী কে? হিন্দা কে? দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনো খুনির নাম বলা হয়, তাহলে ইসলাম গ্রহনের পূর্বে নবীজীর প্রিয় চাচা হামজা রা. এর হত্যাকারী খুনি ওয়াহশির নাম আসবে। যদি বলা হয় দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কাপালিক জল্লাদ নারীর নাম বলুন, তাহলে হিন্দার নাম আসবে। যেই জালেম নারী সাইয়্যেদানা হযরত হামজা রা. এর কলিজা চিবিয়েছিল। নাম আসবে ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন আবু জাহেলের কোলে প্রতি পালিত তার ছেলে ইকরামা। এরা সকলেই ইসলামের শত্রুদের মধ্যে প্রথম

সারির দুশমন। এরা সকলেই দাওয়াত ইলাল্লাহর একটি আহারে সাহাবীয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ে গিয়েছেন। তারা সম্বোধন পেয়েছেন 'রাদিআল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহ'-এর। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্য প্রেম, দা'য়ী হোক আর ইসলামের সিপাহী-ই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা নিজে দাওয়াহ ইলাল্লাহর ফর্মুলা ব্যবহারকারীর জন্য শত্রুতার চিকিৎসার বলে দিয়েছেন। فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ তার মাঝে ও তোমার মাঝে যদি শত্রুতা থাকে তাহলে তা অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে। [২১]

আসুন! এই ফর্মুলার প্রভাব দেখার জন্য ছয়শত বছর পিছনে চলুন। ইতিহাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় খুনি ও বর্বর জাতির নাম যদি নেন তাহলে বলতে হবে তাতারী, চেঙ্গেজী, চেঙ্গিশ খা আর হালাকু খার জাতির নাম। যাদের রগরেশা ও শরিরের অনুকণায়, রক্তের প্রতিটি ফোটায় মুসলমানের দুশমনিতে টগবগ করতো। তাদের তৃতীয় ধারা ছিল তাতারী হুকুমতের সীমানায় মুসলমানের প্রবেশ ছিল কঠিন অপরাধ। কোনো মুসলিম যদি রাজদরবারের সীমানায় প্রবেশ করে, তাহলে তাকে লাঞ্ছিত করে হত্যা করা হবে। তারা মুসলমানদের যেই দেশেই প্রবেশ করেছে সেই দেশেই রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। ঐতিহাসিকগণ অস্থির অবস্থায় তাদের নির্যাতনের কাহিনী লিখেছেন। অনেকে তো লিখার সময় আক্ষেপ করে নির্যাতনের ঘটনাবলী লিখেছেন। আর বলেছিল হায়, আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন, তাহলে আমাকে এই নির্যাতন আর বর্বরতার ঘটনাবলী লিখতে হতো না। আমার এই নির্মম জুলুম অত্যাচারের ঘটনা বলি লিখার পূর্বে যমিন যদি ফেটে যেতো আর আমি যদি তার মধ্যে ঢুকে যেতাম!

সপ্তাহ পর্যন্ত দজলা ও ফোরাতের পানি মুসলমানের রক্তে লাল ছিল। কখনও আবার মুসলিমদের লাইব্রেরী জালিয়ে দিয়েছে। বইয়ের ছাইয়ে নদীর পানি কালো হয়ে যেত। মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে কেউ যদি বলে সূর্য পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিকে উদিত হয়েছে এটা

[২১] হামীম সেজদা-৩৪

বিশ্বাস করো, কিন্তু তাতারীরা হেরে গেছে- এটা বিশ্বাস করো না। এই বর্বর জাতির শত্রুতাকে শেষ করার জন্য আল্লাহর এক বান্দা জানকে নিজের হাতের মুঠোয় রেখে রাজ-দরবারের সীমানায় প্রবেশ করে ফেলেছে। তখনকার বাদশা তাইমুরের কানের সাহায্যে তার অন্তরে দাওয়াত ইলাল্লাহর একটি আহার পৌঁছানো হয়েছে। অন্যদিকে তারা বাদশাহ ও ওজিরদেরকে হত্যা করে তাদের স্ত্রী কণ্যাদেরকে বাদি বানিয়ে রেখেছিল, তাদের মধ্যে যাদেরকে বেশী পছন্দ হতো তাদেরকে তারা বিয়ে করে তাদের হেরেমে রেখে দিত। সেই নারীরা তাদেরকে চুপে চুপে ইসলামের দাওয়াতের ওষুধ পান করিয়ে ভিতরে ভিতরে তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে ফেলেছিল। এক দিন এমন সময় এসেছে যে, এই বর্বর জালিম অত্যাচারী জাতি একত্রে সকলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। এমনকি ইসলামের ঝান্ডাবাহক এবং নিদর্শন হয়ে গিয়েছে। আওরঙ্গজেব ও বাদশাহ শাহজাহানরাই হলো সেই তাতারীদের বংশধর যারা ইসলামের শান ও মর্যাদা ধরে রেখেছিল। এটা হলো শুধুমাত্র দাওয়াতের জাদুময় প্রভাব।

দুশমনকে বন্ধু বানানোর এই ফরমূলা আজও প্রভাব সৃষ্টি করছে, যা অভিজ্ঞতার সাথে প্রমাণিত। এই ফর্মুলা ব্যবহারের দ্বারা বাবরী মসজিদ শহিদকারী, প্রথমে কোদাল পরিচালনাকারী, এই মসজিদের ইটকে মন্দিরে নিয়ে তিনদিনব্যাপী প্রসাবকারী, ইসলামের দুশমনিতে চিহ্নিত ব্যক্তি আজ আমের ও ওমর হয়ে গিয়েছে। মসজিদ আবাদ ও নতুন মসজিদ নির্মাণ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। একজন আদর্শ দা'য়ী হয়ে গিয়েছে। মালিয়ানায় জুমার দিনে রমজানের শেষ জুমায় অনেক রোজাদারকে শহীদকারী "আব্দুর রহমান" হয়ে যায়। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ১৫ বছরের ভাতিজিকে পেট্রল ঢেলে নিজ হাতে হত্যাকারী এবং বহু মুসলিমকে হত্যাকারী "আব্দুল্লাহ" হয়ে গুজরাটের দাঙ্গার সময় হাজারো মুসলমানের জীরনরক্ষাকারী হচ্ছে।

কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত একটি চিরস্থায়ী সংবিধান। কুরআন মাজিদের এই উজ্জ্বল ও উপকারী ফর্মুলা যা শুত্রুকে বন্ধু বানায় তা কুরআন নাজিল হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত সকল

মানুষের জন্য প্রযোজ্য হবে। তার পূর্ণ প্রভাবও অবশিষ্ট থাকবে। আজ পর্যন্ত যারাই কুরআনের ইসলাম এবং মুসলমানের দুশমনির ওষুধ হিসাবে এই ফরমুলাকে ব্যাবহার কারেছে, এমন একটিও ঘটনা পাওয়া যাবে না যার প্রভাব দেখা যায়নি বা সেই রোগ শেষ হয়নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর জীবদ্দশায় যারা ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন ছিল, তাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক ধরণের দুশমন ছিল তারা যারা অজ্ঞতা ও ভুল বুঝার কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন ছিল। এদের মধ্যে এমন একজনও নেই যাদেরকে দাওয়াত ইলাল্লাহর ফর্মুলা দেয়া হয়েছে আর ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের সিপাহী না হয়েছে। হোক তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব, ওয়াহসি বা হিন্দাহ। ইকরামা ইবনে আবু জাহেল, শামামা বিন আসাল, এবং রোক্কানা বাহাদুর। দ্বিতীয় প্রকারের দুশমন ছিল তারা, যারা ইসলামের সত্যতা জেনে বুঝেই ইসলামের শত্রুতা করতো। তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছার পর তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের সেবক হওয়া পছন্দ করেনি, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া থেকে তাদের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিয়েছে।

মোটকথা, এই ফর্মুলা দ্বারা অবশ্যই শত্রুতা শেষ হয়ে যাবে, শত্রু বন্ধু হয়ে যাবে। যদি তার ভাগ্যে হেদায়াত থাকে তাহলে দুশমনি দূর হয়ে যাবে। আজ দুনিয়াতে যারাই ইসলামের দুশমনি করছে, যদি বলা হয় এক হাজারের ৯৯৯ জনই হলো অজ্ঞতা ও ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝার কারণে হচ্ছে তাহলে তাহলে এটাই সঠিক প্রমানিত হবে। তাদেরকে যদি দাওয়াত ইলাল্লাহর খোরাক দেওয়া হয় তাহলে এরা সকলেই ইসলামের দুশমনি থেকে তাওবা করে ইসলামের ঝান্ডাবহী ও দা'য়ী হয়ে যাবে। দশহাজারের মধ্যে থেকে যদি একজনও জেনে বুঝে ইসলামের শুত্রুতা করে তাহলে দাওয়াত ইলাল্লাহর পর আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়মেই তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাাবে। এটা তখনই হবে যখন তাকে দাওয়াত ইলাল্লাহর খোরাক পান করানো হবে। অর্থাৎ দাওয়াতের হুজ্জত পূরণ করা হবে। পুরো দুনিয়ার রোগ হলো মানবতা। কুফর শিরকের ধ্বংসাত্বক রোগ, ইসলামের শত্রুতার মানবতার অসুস্থ মানসিকতার চিকিৎসার জন্য খতমে নবুওয়াতের ঘোষণা

দিয়ে আমাদেরকে সর্বোত্তম জাতির মর্যাদা দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (١١٠)

তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের জন্য তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে। এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে।[২২]

আফসোস! আমরা আমাদের অবস্থানকে ভুলে দুনিয়ার প্রতি ঝাপটি খেয়ে পড়ছি। তাদের চিকিৎসার ফিকির ছেড়ে দিয়েছি। যে সব চিকিৎসককে রোগীদের সুস্থতার জন্য যে ফরমুলা আরোপ করা হয়েছে, তারা রোগীকে দেখে ভয় পাচ্ছে। এতে রোগীর চিকিৎসার সম্ভবনাই শেষ হয়ে যায়। এর চেয়ে আফসোসের বিষয় হলো, যেই চিকিৎসককে উত্তম জাতির উপাধি দিয়ে নবুওয়াতের কাজের প্রতিনিধি বানানো হয়েছে, দাওয়াত ইলাল্লাহর ফর্মুলা দিয়ে রোগীদের সুস্থতা ও চিকিৎসার জিম্মাদারী দেওয়া হয়েছিল, তারা সেই ফর্মূলার প্রতি আস্থার পরিবর্তে দাওয়াতের কাজকে দুশমন ও বিরোধী হওয়ার মাধ্যম মনে করছে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক ও আফসোসের বিষয়।

একটি মূলনীতি হলো, কোনো ওষুধ কোম্পানি যখন কোনো ওষুধ তৈরী করে, তখন সেই ওষুধের টার্গেট থাকে নির্দিষ্ট একটি রোগ নিরাময় করা। এটা ভিন্ন বিষয় যে, এর প্রভাবে প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য কোনো রোগের উপকার হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইউনানী চিকিৎসকগণ 'সমিরা গাওজবা আম্বরী জাওয়াহের ওয়ালা' নামে একটি ওষুধ তৈরী করেছে। এই খমিরা হার্ট ও ব্রেনের দুর্বলতাকে দূর করার জন্য বানিয়েছে। স্মৃতিশক্তিকে বৃদ্ধি করা, নির্দিষ্ট রোগের পর সকল দূর্বলতাকে দূর করা রোগীর প্রতিরক্ষা শক্তিকে বৃদ্ধি করা এসব তার প্রাসঙ্গিক উপকার। বরং ওষুধটি মূলত বানানো হয়েছে স্মৃতি শক্তিকে বৃদ্ধি করার জন্য। তাই খমিরার প্যাকিং এ শুধু এতুটুকু লেখা থাকে ব্রেন ও হার্টের জন্য উপকারী। এমনি ভাবে হজমের ও পাকস্থলির এবং কলিজা শক্তিশালী করার জন্য মূলত বানানো

[২২] আলে ইমরান-১১০

হয়েছে। এই ওষুধটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করলে মূত্রাশয়ে পাথর হওয়া বন্ধ করে। আত্মা ও কিডনির দুর্বলতার জন্যও উপকারী। এ সবগুলো হলো তার প্রাসঙ্গিক উপকার। কিন্তু তার প্যাকিং-এ লেখা থাকে হার্ট ও কলিজার জন্য উপকারী।

ঠিক এমনি ভাবে দাওয়াতের উপকার হলো দাওয়াতের মাধ্যমে উম্মতকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে। হীনমন্যতা দূর হবে। নেতিবাচক চিন্তা শেষ হবে। ইতিবাচক চিন্তা সৃষ্টি হবে। দা'য়ীর আখলাক ও আমলের এসলাহ হবে। পরকালে অনেক প্রতিদান-সওয়াব পাবে। কিন্তু কুরআনে কারীমে দাওয়াতে ইলাল্লাহর মৌলিক যে ফায়দাটি বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা রোগের সুস্থতার যে ফর্মুলা দিয়েছেন, তা যেন প্যাকিং -এর মধ্যে ফর্মুলা লিখে দেওয়া হয়েছে। তা হলো,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। [২৩]

আশ্চর্যের বিষয় হলো, ঐ চিকিৎসককে উত্তম জাতির মর্যাদা যেই শেফার ফর্মুলার মাধ্যমে দান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা শত্রুকে বন্ধুত্বে পরিণত করার যেই প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং দুশমনের রোগ নিরাময়ের জিম্মাদারী দিয়েছেন, সেই চিকিৎসক বলে যারা তার কর্নধার , জাতির বিশেষ থেকে বিশেষতম লোকেরাও অনেক ওলামাও বলেন এবং মনে করেন, যদি অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়, দাওয়াত ইলাল্লাহর পানীয় পান করানো হয়, তাহলে বিরোধী হয়ে যাবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। রাষ্ট্র ও সংগঠন শত্রু হয়ে যাবে। কেমন জানি বিশ্বজগতের স্রষ্টার পক্ষ থেকে দুশমনকে বন্ধুতে রুপান্তরিত করার যেই ফর্মুলা দেয়া হয়েছে তা চিকিৎসা ও শেফা বলা ও বুঝার পরিবর্তে রোগ বৃদ্ধির কারণ মনে করছি। পক্ষান্তরে, ইতিহাসের কিতাবে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যে এই ফর্মুলা পালন করে বিশ্বের মানবতার অতুলনীয় প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। এ যুগেও

[২৩] হামীম সেজদা-৩৪

রয়েছে অগণিত প্রমান। আমাদের এবং উম্মতের বিশেষ লোকদের খেয়াল দেখে মনে হয়, আমরা আমাদের মর্যাদার অপমান করছি। এই চিন্তা চেতনা যে, আমরা যদি দাওয়াত দেই তাহলে শত্রুতা বেড়ে যাবে, সকলেই বিরোধী হয়ে যাবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এ সব ঈমান বিরোধী চিন্তা।

ঈমান হলো, আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেছেন, তা স্বচক্ষে দেখা ও অভিজ্ঞতার চেয়েও বেশী সত্য মনে করা এবং তা সত্য হওয়ার ব্যপারে বিশ্বাস রাখা। হাদিসের কিতাবগুলোতে একটি ঘটনা পাওয়া যায়, এক সাহাবী রা. -এর পেট ব্যথা রোগ ছিল। ওই সাহাবী রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার পেট খারাপ হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মধু খাও মধুতে শেফা রয়েছে। সাহাবী রা. মধু খেয়েছেন, তার রোগ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার দরবারে রেসালাতে হাজির হলেন। এসে নিজের অবস্থা বললেন যে আমি মধু খেয়েছি কিন্তু আমার রোগ আরো বেড়ে গিয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ সত্য আল্লাহর রাসূল সত্য। তুমি মধু খাও, মধুতে শেফা রয়েছে। সাহাবী এই বলে চলে গেলেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সত্য বলেছেন। এবার গিয়ে আবার মধু খেলেন, এবার তার রোগ আরো বেড়ে গেল। আবার দরবারে রেসালাতে গিয়ে রোগ বৃদ্ধির অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ সত্য, আল্লাহর রাসূল সত্য। যাও, মধু খাও, মধুর মধ্যে শেফা রয়েছে।

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু খাও, অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ কর। তার পেট থেকে নির্গত হয় বিভিন্ন রং -এর পানীয় যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন।[২৪]

[২৪] সূরা নাহল-৬৯

ওই সাহাবী এই বলে আবার চলে গেলেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সত্য বলেছেন। এবার গিয়ে আবার মধু খেলেন, এই বার তার রোগ ভালো হয়ে গেল। সাহাবী রা. বলেন, এরপর আমার জীবনের আর কোনো দিন আমার পেট ব্যথা হয়নি। এ ছিল ঈমান। নিজ অভিজ্ঞতার বিপরীতে আল্লাহ সত্য বলেছেন, রাসূল সত্য বলেছেন -এর উপর বিশ্বাস রেখে মধু ব্যবহার করেছেন। ঈমান তো হলো- এই নিজ অভিজ্ঞতার বিপরীতেও যদি কোনো কিছু আসে তবে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বলা জিনিসকে সত্য মানতে হবে। আশ্চর্যজনক ও আফসোসের বিষয় হলো দাওয়াত ইলাল্লাহর ওই ফর্মুলা বলে দিয়েছেন। যেই ফর্মুলার মাধ্যমে পুরো মানব জাতির ইতিহাস সাক্ষি যে, এর দ্বারা মানুষ শেফা পাচ্ছে।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

যা সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।[২৫]

আর এই উম্মতের সাধারণ মানুষ নয়, বরং যারা কুরআন পড়ান-শিখান, তাদের মধ্যেও অনেকে মনে করে, এবং নির্দ্বিধায় বলেন যে, দাওয়াত দিলে মানুষ বিরোধী হয়ে যাবে। শত্রু হয়ে যাবে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। যেন মনে হয় কুরআনের এই ফর্মুলা শেফা দিবে না, রোগ সৃষ্টি করে দিবে। এই চিন্তা আমাদের মার্যদার বিপরীত তো বটেই বরং আল্লাহর কিতাব কুরআনের উপর ঈমান বিরোধী। সকলকে নিজ ঈমান বৃদ্ধির ফিকির করা উচিত।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআনে হাকিমের ফর্মুলার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে দুশমনকে বন্ধু বানানোর এই ফর্মুলার দ্বারা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সমস্যার সামাধানে এই ফর্মুলার মূল্যায়ন করা ও তার ব্যবহারের তৌফিক দান করুন। এই জিম্মাদারদেরকে উত্তম জাতি হওয়ার যে মহান মর্যাদা দান করা হয়েছে, সকলকে তার সম্মান রাখার তৌফিক দান করুন। আমিন।

সমাপ্ত

[২৫] হামীম সেজদা-৩৪